শিক্ষানীতি
ও
শিক্ষা সংকট
প্রসঙ্গে

খালেকুজ্জামান

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৯৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০১
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ অক্টোবর ২০০৪

প্রকাশক ঃ
সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট
কেন্দ্রীয় কমিটি
২৩/২ তোপখানা রোড (৩য় তলা), ঢাকা - ১০০০।
ফোন ঃ ৯৫৭০৫৭৫, ফ্যাক্স ঃ ৯৫৫৪৭৭২
ই-মেইল ঃ mail@spb.org.bd

দাম ঃ ২৫ টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভুমিকা

আমাদের দেশে ১৯৯০ সালে যে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল তার পটভূমি ছিল ১৯৮৩ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কুখ্যাত মজিদ খানের শিক্ষানীতিবিরোধী আন্দোলন। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য প্রণীত ১০ দফায় শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী ও অভিভাবকদের মতামত নিয়ে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও শোষণমুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে অবিলম্বে একটি সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার দাবি জানানো হয়েছিল। সে সময় এরশাদ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী ৫ দল, ৮ দল ও ৭ দলীয় জোট সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ১০ দফা দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে ক্ষমতায় গেলে তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিল। সেজন্য এদেশের ছাত্রসমাজসহ শিক্ষানুরাগী সকল মানুষের প্রত্যাশা ছিল '৯০-এর পর যারাই ক্ষমতায় আসবে তারাই ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, ইতোমধ্যে বিএনপি ৫ বছর ক্ষমতায় ছিল, তারা এর ধারে কাছেও যায় নি। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। শুরুতেই তারা ছাত্রসমাজের রক্তস্নাত ১০ দফাকে পাশ কাটিয়ে ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শামসুল হক কমিটিকে একটি ছক বেঁধে দেয়। '৯৭-এর সেপ্টেম্বরে সে কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। ঐ রিপোর্টেও ছাত্রসমাজের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় নি। ফলে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ অন্যান্য প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষানুরাগী মহল ঐ রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করে। ছাত্র-জনতার প্রতিবাদের মুখে সরকার সে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারে নি।

২০০১ সালে বিএনপি পুনরায় জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট ও জাপা'র একাংশের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন হয়। ক্ষমতাসীন হয়েই তারা শিক্ষা সংস্কারের কথা বলে একের পর এক পদক্ষেপ নিতে থাকে, যাতে শিক্ষা সংকোচনের ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় জোট সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মনিরুজ্জামান মিঞাকে প্রধান করে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ৫৪ সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন - ২০০৩' গঠন করে। ২০০৪ সালের ৩১ মার্চ কমিশন "বর্তমান শিক্ষা কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা বাঞ্ছনীয়" মত ব্যক্ত করে রিপোর্ট পেশ করে।

কমিশনের অগণতান্ত্রিক গঠন কাঠামোর বিরোধিতা করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট শুরু থেকেই তা বাতিলের দাবি জানিয়ে এসেছে; কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর এর অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যমূলক প্রস্তাবনার স্বরূপ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছে। একই সাথে এই রিপোর্ট বাতিল করে ১০ দফার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি সর্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক সেক্যুলার একই পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবিতে সংগ্রাম জারি রেখেছে। বিভিন্ন শিক্ষানুরাগী মহলও এ দাবিতে সোচ্চার রয়েছেন।

শিক্ষানীতির সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। সংগঠনের মুখপত্র 'অভিমত'-এ শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু লেখা নানা সময়ে প্রকাশ করেছে। শিক্ষানীতি সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা সংকলিত করে ১৯৮৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত 'শিক্ষা প্রসঙ্গে' পুস্তিকাটি ঐ সময়ের শিক্ষানীতি-বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আওয়ামী লীগ প্রণীত শামসুল হক কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৯৭ সালের ১১ জুলাই সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তর পূর্ণ সদস্যদের এক সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান অতীতের বিভিন্ন আলোচনার আলোকে বাংলাদেশে বিরাজমান শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ, তার সংকট ও শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে একটা বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বিভিন্ন সভায় এর ওপর আরও বিশদভাবে আলোচনা করেন।

তাঁর ঐসব আলোচনাকে ভিত্তি করে ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে ''শিক্ষানীতি ও শিক্ষাসংকট প্রসঙ্গে" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। তখন এটিকে আমরা শিক্ষানীতি সম্পর্কিত খসড়া প্রস্তাবনা হিসেবে উল্লেখ করেছিলাম। শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের মতামত, আমাদের লড়াই-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এ প্রস্তাবনাটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার অভিপ্রায়ও সে সময় ব্যক্ত করা হয়েছিল। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের সীমিত সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের

সর্বস্তরের মানুষের কাছে খসড়া প্রস্তাবনাটি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। এ খসড়া প্রস্তাবনাকে ভিত্তি করে আমাদের সংগঠনের উদ্যোগে ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে ১৯৯৯ সালের ১৬ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ৬ দিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে এবং এর পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও জেলায় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষ এ সকল শিক্ষা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করে আমাদের প্রস্তাবনাকে আরো সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা পালন করেছেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্মেলনের ১২৯ জন আলোচকসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও জেলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা সম্মেলনের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ আলোচকের বক্তব্য সংকলিত করে ২০০১ সালের জানুয়ারিতে আমরা 'শিক্ষা সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশ করি। এ প্রকাশনাটিও শিক্ষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

'শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে' পুস্তিকাটির প্রথম মুদ্রণের সব কপি, অর্থাৎ চল্লিশ সহস্রাধিক কপি দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় পুস্তিকাটির দ্বিতীয় মুদ্রণ সামান্য কিছু সংশোধন-সংযোজনসহ স্মারকগ্রন্থের সাথে প্রকাশ করা হয়। স্মারকগ্রন্থটিও শেষ হওয়ার পথে।

ইতোমধ্যে জোট সরকার ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষানুরাগী মহলের সকল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে। এ রিপোর্টকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ছাত্রসভায় কমরেড খালেকুজ্জামান বিশদ বক্তব্য রাখেন। তার কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ যুক্ত করে এবং তথ্য-পরিসংখ্যানগুলো যথাসম্ভব হালনাগাদ করে আমরা 'শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে' পুস্তিকাটি পুনঃপ্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা চলমান শিক্ষাআন্দোলনে একটা গতি ও দিকনির্দেশনা রাখবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।

নানা মহলের মতামত, আলোচনা-সমালোচনা এবং আমাদের অভিজ্ঞতা-সংগ্রামে আমরা ইতোমধ্যে যতটুকু সমৃদ্ধ হতে পেরেছি-তার ভিত্তিতে পরিমার্জন ও সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও যতটুকু অপূর্ণতা রয়ে গেল তা পূরণের জন্য আবারও আমরা সর্বমহলের কাছে মতামত, সমালোচনা ও পরামর্শ জানানোর আহ্বান রাখছি। আমরা আশাবাদী-আমাদের লড়াই-সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাদরদী সকল মানুষের মতামত প্রস্তাবনাটিকে ধাপে ধাপে আরও সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলবে।

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে কমরেড খালেকুজ্জামানের বক্তব্য এই পুস্তিকার শেষে সংযুক্ত করা হলো। এ পুস্তিকাটিতে প্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষানুরাগী অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানাভাবে সে-সব উদ্ধৃতি সংক্ষেপ করতে হয়েছে। এতে যদি কারও বক্তব্যের তাৎপর্যহানি ঘটে থাকে, সে জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

খালেকুজ্জামান লিপন
সভাপতি

মোশাররফ হোসেন
সাধারণ সম্পাদক

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

আমাদের দেশে ১৯৯০ সালে যে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল তার পটভূমি ছিল ১৯৮৩ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কুখ্যাত মজিদ খানের শিক্ষানীতি বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের প্রণীত ১০ দফায় শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী ও অভিভাবকদের মতামত নিয়ে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও শোষণ মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে অবিলম্বে একটি সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার দাবি জানানো হয়েছিল। সে সময় এরশাদ স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনকারী ৫ দল, ৮ দল ও ৭ দলীয় জোট সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ১০ দফা দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে ক্ষমতায় গেলে তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিল। সেজন্য এদেশের ছাত্র সমাজসহ শিক্ষানুরাগী সকল মানুষের প্রত্যাশা ছিল '৯০-এর পর যারাই ক্ষমতায় আসবে তারাই ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, ইতোমধ্যে বিএনপি ৫ বছর ক্ষমতায় ছিল, তারা এর ধারে কাছেও যায় নি। বর্তমানে চলছে আওয়ামী লীগের শাসন। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসেই তারা অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। এবং

শুরুতেই তারা ছাত্র সমাজের রক্তস্নাত ১০ দফাকে পাশ কাটিয়ে ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শামসুল হক কমিটিকে ছক বেঁধে দেয়। '৯৭-এর সেপ্টেম্বরে সে কমিটি সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। দেখা গেছে ঐ রিপোর্টেও ছাত্র সমাজের আকাঙ্ক্ষা মার খেয়েছে। ফলে ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সহ বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষানুরাগী মহল ঐ রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবিতে সংগ্রাম শুরু করেছে।

শিক্ষানীতির এই সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। এরই অংশ হিসেবে ১৯৯৭ সালের ১১ জুলাই সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তর পূর্ণ সদস্যদের এক সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) কেন্দ্রীয় কমিটি আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান বাংলাদেশের বিরাজমান শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে উক্ত বিষয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা করেন। তাঁর ঐসব আলোচনার ভিত্তিতে এই পুস্তিকাটি রচিত। উল্লেখ্য, পুস্তিকাটি আমরা একটি খসড়া প্রস্তাবনা হিসেবে প্রকাশ করছি। পরবর্তীতে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সর্বমহলের মতামতের ভিত্তিতে এই প্রস্তাবনাটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে। আমাদের প্রত্যাশা এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষানুরাগী মানুষেরা সর্বাত্মক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসবেন।

এ পুস্তিকাটিতে প্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষানুরাগী অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানাভাবে সে-সব উদ্ধৃতি সংক্ষেপ করতে হয়েছে। এতে কারও বক্তব্যের তাৎপর্যহানি ঘটে থাকলে আমরা সে জন্য দুঃখিত।

নূরুল ইসলাম
সভাপতি

সাইফুর রহমান তপন
সাধারণ সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ ঃ দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

আমাদের দেশে ১৯৯০ সালে যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল তার পটভূমি ছিল ১৯৮৩ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কুখ্যাত মজিদ খানের শিক্ষানীতি বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য প্রণীত ১০ দফায় শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী ও অভিভাবকদের মতামত নিয়ে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও শোষণ মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে অবিলম্বে একটি সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার দাবি জানানো হয়েছিল। সে সময় এরশাদ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী ৫ দল, ৮ দল ও ৭ দলীয় জোট সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ১০ দফা দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে ক্ষমতায় গেলে তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিল। সেজন্য এদেশের ছাত্র সমাজসহ শিক্ষানুরাগী সকল মানুষের প্রত্যাশা ছিল '৯০-এর পর যারাই ক্ষমতায় আসবে তারাই ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, ইতোমধ্যে বিএনপি ৫ বছর ক্ষমতায় ছিল, তারা এর ধারে কাছেও যায় নি। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসেই অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। এবং শুরুতেই ছাত্রসমাজের রক্তস্নাত ১০ দফাকে পাশ কাটিয়ে ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শামসুল হক কমিটিকে ছক বেঁধে দেয়। '৯৭-এর সেপ্টেম্বরে সে কমিটি সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। দেখা গেছে ঐ রিপোর্টেও ছাত্রসমাজের সে আকাঙ্খা মার খেয়েছে। ফলে ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ অন্যান্য প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষানুরাগী মহল ঐ রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করে। একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবিতে সংগ্রাম শুরু করেছে।

শিক্ষানীতির এই সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। এরই অংশ হিসেবে ১৯৯৭ সালের ১১ জুলাই সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তর পূর্ণ সদস্যদের এক সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-এর কেন্দ্রীয় কমিটি আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান বাংলাদেশে বিরাজমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সভায় উক্ত বিষয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা করেন।

তাঁর ঐসব আলোচনা ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে "শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে" নামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। তখন এটিকে আমরা খসড়া প্রস্তাব এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের মতামত, আমাদের লড়াই-সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এ প্রস্তাবনাটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে বলে উল্লেখ করেছিলাম। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের সীমিত সামর্থ অনুযায়ী দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে খসড়া প্রস্তাবনাটি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। এ খসড়া প্রস্তাবনাকে ভিত্তি করে ইতোমধ্যে ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-জেলায় আমাদের সংগঠনের উদ্যোগে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে সমাজের সকল স্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষেরা মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করে আমাদের প্রস্তাবনাকে আরো সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা পালন করেন।

প্রথম মুদ্রণের সবকয়টি কপি অর্থাৎ চল্লিশ সহস্রাধিক কপি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ফলে পুস্তিকাটির দ্বিতীয় মুদ্রণ শিক্ষা সম্মেলন স্মারকগ্রন্থের সাথে ছাপাতে হলো। নানা মহলের মতামত, আলোচনা-সমালোচনা, আমাদের অভিজ্ঞতা সংগ্রামে আমরা ইতোমধ্যে যতটুকু সমৃদ্ধ হতে পেরেছি-এ স্বল্প সময়ে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সে মাত্রায় পরিমার্জন করা যায় নি। আমরা আশাবাদী-আমাদের লড়াই-সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাদরদী সকল মানুষের মতামত প্রস্তাবনাটিকে ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ করে তুলবে।

এ পুস্তিকাটিতে প্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষানুরাগী অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানাভাবে সে-সব উদ্ধৃতি সংক্ষেপ করতে হয়েছে। এতে কারও বক্তব্যের তাৎপর্যহানি ঘটে থাকলে আমরা সে জন্য দুঃখিত।

নূরুল ইসলাম
সভাপতি

খোকন দাস
সাধারণ সম্পাদক

শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে

শিক্ষানীতি নিয়ে, শিক্ষার দর্শন নিয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে এদেশে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অনেক জল্পনা-কল্পনা, বহু পরিকল্পনা হয়েছে। কিন্তু তা কোন সময়েই ছাত্রজনতার আকাঙ্ক্ষা ধারণ করতে পারে নি। সমাজ বিকাশের চাহিদা ও তাগিদ পূরণ করতে পারে নি। বিএনপি-জামাত জোট সরকার শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে গত ১৫ জানুয়ারি ২০০৩ একটি কমিশন গঠন করে এবং এই কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতি ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের ঘোষণাও দেয়।

বিগত শাসকদের মতোই পার্লামেন্টের ভিতরে-বাইরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সমাজের বিভিন্ন বিরুদ্ধ মতসহ শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-শিক্ষানুরাগী মহল এবং অপরাপর সকল মতের সাথে বিনিময় ও সংঘর্ষের প্রক্রিয়ায় শিক্ষানীতি চূড়ান্তকরণের কথা তাদের তরফ থেকে একভাবে বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তারা তা এড়িয়ে গিয়ে নিজেদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মাফিক যখন-যে অংশে যেমন খাটে, তেমনভাবে বাস্তবায়নের পথ নিয়েছে। তবে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনসহ শিক্ষানুরাগী মহল এই শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে প্রণীত শিক্ষানীতিকে 'ধনী-গরিব বৈষম্যমূলক' আখ্যায়িত করে ছাত্রসমাজ ও শিক্ষানুরাগী মহল প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের আন্দোলনের মুখে সরকার সেই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারে নি।

স্বাধীনতার পূর্বাপর সরকারগুলো একের পর এক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে, ছাত্রসমাজ তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু ছাত্রসমাজ ও শিক্ষানুরাগী মহলের প্রত্যাশিত শিক্ষানীতি কখনোই প্রণীত হয় নি, বাস্তবায়ন তো দূরের কথা। সেজন্য শিক্ষানীতি নিয়ে একটা বিতর্ক সবসময়ই থেকে গেছে।

বর্তমান শিক্ষানীতি বা যে কোন শিক্ষানীতির ভাল-মন্দ বিবেচনার আগে আমাদের বোঝা দরকার, শিক্ষানীতি বলতে আমরা কি বুঝি। শিক্ষা প্রশ্নে দুটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি নীতিগত। অর্থাৎ কাদের জন্য শিক্ষা, কি হবে শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য কি। এ বিষয়টির সাথে জড়িত

রয়েছে কি ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় কোন্ শ্রেণীচরিত্রের শাসকদের দ্বারা শিক্ষানীতি প্রণীত হচ্ছে, তারা শিক্ষাকে কি দৃষ্টিতে দেখছে, কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে এবং শিক্ষার দায়িত্ব ও ব্যয়ভার রাষ্ট্র কতখানি বহন করছে।

অপরটি শিক্ষার পদ্ধতিগত বিষয়। যেমন; শিক্ষাদান রীতি কি রকম হবে, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন হবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার গুণ-মান যাচাই কিভাবে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ তথা দেহে-মনে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য কি ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন থাকবে। শিক্ষার সিলেবাস-কারিকুলাম কাদের দ্বারা, কিভাবে রচিত হবে। পরিবর্তনশীল জগৎ-জীবন ও সমাজের বৈপ্লবিক বাস্তবতা তথা সমাজের প্রগতিশীল রূপান্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে পাঠ্যসূচি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও রূপান্তরের বিধান ও সময়সীমা কিভাবে নির্ধারিত হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও পরিচালন ব্যবস্থার নিয়ম-বিধি কি রকম হবে ইত্যাদি।

সব মিলে শিক্ষার দর্শন অর্থাৎ শিক্ষাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার ধারা ও প্রয়োগ-পদ্ধতি নিরূপণ করা খুবই জরুরি। 'সবার জন্য শিক্ষা'-এই নীতিকেই সাধারণভাবে সর্বজনীন, গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি বলা হয়। আর 'টাকা যার, শিক্ষা তার' কিংবা 'শাসকদের ইচ্ছা যতখানি, শিক্ষা পাবে ততখানি'-এই নীতি পুঁজিবাদী এবং স্বৈরতান্ত্রিক নীতির পর্যায়ে পড়ে। সে-দিক থেকে বিচার করলে এ জাতি কখনোই সর্বজনীন-গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির মুখ দেখে নি।

মানব পরিচয়ের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য শিক্ষা। কিন্তু 'মানব পরিচয়ে জন্মেছে যে, শিক্ষার আলোতে-উত্তাপে-শক্তিতে বাড়বে সে'-এই নীতির ভিত্তিতে এ জাতি তার পরিচয় কখনোই তুলে ধরতে পারে নি। সেই অর্থে শিক্ষার প্রশ্নে মানবতা ও মানবাধিকার থেকেও এ জাতি বঞ্চিত রয়েছে বহুকাল।

শিক্ষার অধিকার মানবিক

পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যার চেতনা আছে, সমাজ আছে, সভ্যতা আছে। মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার আদিকালে বিবর্তনের ধারায় মানব মস্তিষ্কে একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। যার ফলে মানব মস্তিষ্ক চিন্তা করার গুণ ও ক্ষমতা অর্জন করে। অন্য কোন প্রাণী সে ক্ষমতা পায় নি। সেজন্যে শুরু থেকেই মানুষের সাথে অন্য সকল প্রাণীর একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মানুষ ছাড়া সকল প্রাণীই প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মানুষ তা করে নি। বরং নিজের বাঁচার এবং বিকাশের উপযোগী করে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিরুদ্ধ পরিবেশকে পাল্টাবার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বাঁচতে চেয়েছে। ভাঙার ও নির্মাণের এই শ্রমসাধ্য কাজের সামনে দেখা দেয়া অসঙ্গতি দূর করার সংগ্রাম করতে করতে এগিয়েছে।

নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়েছে। এটা করতে গিয়ে বস্তুর গুণাগুণ ও নিয়ম সম্পর্কিত ধারণাগুলো পেয়েছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে টিকে থাকার সংগ্রাম আর বস্তুকে পাল্টানোর প্রচেষ্টা এই উভয় কাজেই মানুষ মানুষের সহযোগিতা নিয়েছে, পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে। এভাবেই মানুষ সমাজের গঠন ও বিকাশ সাধন করেছে।

বস্তুকে পাল্টাতে গিয়ে, যুৎসই ও নিখুঁত করতে গিয়ে মানুষ বস্তুর মাঝে সুষমা সৌন্দর্যবোধেরও সন্ধান পেয়েছে। নব-নব বস্তুসামগ্রী উৎপাদন ও আবিষ্কারের অদম্য স্পৃহা মানুষের মনোজগতে তত্ত্ব-তথ্য, সূত্র-যোগসূত্র অন্বেষার পাশাপাশি রাগ-অনুরাগ, আবেগ-অনুভূতি, স্বস্তি-শান্তি, রূপ-রস-ছন্দ-বর্ণের এক নান্দনিক বোধ ও চাহিদা সৃষ্টি করে। আর তা পূরণ করতে গিয়ে মানুষের সৃষ্টিশীল কর্মচাঞ্চল্য, আচার-অনুষ্ঠান, থাকা-খাওয়া, বেশ-ভূষা, ভাষা-কৃষ্টি সব মিলে গড়ে উঠে সংস্কৃতি-সভ্যতা। সঙ্গীত-সাহিত্য-চিত্রকলা-ভাস্কর্য ইত্যাদিকে আমরা বলি ভাবগত উৎপাদন, যা বস্তুগত উৎপাদনকে অনুসরণ করেই এগিয়েছে।

মিলিতভাবে উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ মানব বৈশিষ্ট্যের নানা রূপ ও বিশ্ব প্রকৃতির বহু বিচিত্র নিয়ম-বিধিরও সন্ধান পেয়েছে। উৎপাদনের বিকাশ তথা সভ্যতা বিকাশের প্রয়োজনে, প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণের সীমা এবং সীমানা নির্ধারণ করতে করতে মানুষ মানবিক সম্পর্ক, প্রেম-ভালোবাসা ও সৌন্দর্যমন্ডিত সংস্কৃতির আদি বুনিয়াদ গড়ে তোলে। সব কিছু মিলে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কিত এ বাস্তব ধারণাগুলোকেই আমরা বলি জ্ঞান বা শিক্ষা। এ শিক্ষা মানুষকে মানুষে পরিণত করেছে। আদিম থেকে আধুনিক করেছে। শিক্ষা মানুষকে দিয়েছে মনুষ্যত্ব, দিয়েছে উৎপাদন বিকাশের নিপুণ দক্ষতা। শিক্ষা

মানুষকে সামাজিক অনাচার প্রতিহত করার শক্তি-সাহস যুগিয়েছে; সংস্কৃতিমান করে গড়ে তুলেছে। সেজন্যই শিক্ষার অধিকার অর্জনের মধ্য দিয়েই মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জনের অধিকারী হয়। আর এ জন্যই শিক্ষার অধিকার মানবিক।

চলতে চলতে ইতিহাসের এক পর্বে মানুষের সমাজে শ্রেণীভেদের জন্ম হয়। মিলিত মানুষের শ্রম-সাধনায় অর্জিত যৌথ সম্পদ-সম্পত্তিকে ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাতের মধ্য দিয়ে ঘটেছে শোষকশ্রেণীর উদ্ভব। তখন থেকেই শাসকশ্রেণী যেমন বস্তুগত উৎপাদনের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে, তেমনি ভাবগত উৎপাদনের উপরও তাদের কর্তৃত্ব কায়েম হয়। তারা শিক্ষাকে দুর্লভ ও বিকৃত করে অন্যায় শাসন-শোষণকে যুক্তিসিদ্ধ করতে চেয়েছে। আর শোষিতশ্রেণী সকল অন্যায়-জবরদস্তি, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে ন্যায়-নীতিবোধ ও মনুষ্যত্ববোধের ধারণাকে সংরক্ষণ করেছে, সমুন্নত রেখেছে, বিস্তৃত ও বিকশিত করেছে। এভাবে সামাজিক চেতনা ও সমাজবিজ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্র রচনা করেছে। অন্যদিকে উৎপাদনের বিকাশধারাকে অব্যাহত রাখতে গিয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছে। এই উভয়বিধ প্রক্রিয়ায় মানুষ শিক্ষার আলো-কে বিস্তৃত করেছে এবং সমাজ-সভ্যতা বিকাশের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করেছে। এভাবেই কায়িক ও মানসিক শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত শ্রমের মধ্য দিয়ে মানুষ সমাজজীবন ও বস্তুজগতের বিকাশের নিয়ম সম্পর্কিত জ্ঞান ও শিক্ষা আয়ত্ত করেছে। এ-সবই মানবজাতির জ্ঞান ভান্ডারে নানা শৃঙ্খলায় সাজানো ও বিন্যস্ত হয়ে আছে।

বস্তুতঃ এ শিক্ষাই মানুষকে পৃথক করে দিয়েছে পশু থেকে, মুক্ত করেছে পশুত্ব থেকে। একটা সমাজে প্রকৃত শিক্ষা যতো বেশি প্রসারিত, সে-সমাজ ততো আলোকিত, সুসংগঠিত-সুসংহত। শিক্ষা যতো উচ্চস্তরের, উৎপাদিকা শক্তি ততো বিকশিত পর্যায়ের। যতো বেশি লোক উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত, সমাজ মনন ও সংস্কৃতি চেতনা ততো উন্নত, বিকাশ বৈচিত্র্য সম্ভারে পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং নিয়মনীতি জ্ঞানে ঐক্যবদ্ধ। যদিও একথা ঠিক যে উচ্চতর মানবিক শিক্ষা ছাড়া উন্নত মানবিক-সমাজ হয় না, শেষ পর্যন্ত সভ্যতা টিকে না, সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা আসে না। শ্রেণীসংগ্রাম তার বিকাশের সঠিক পরিণতিতে যেতে পারে না। প্রকৃতি-পরিবেশের কাছে অসহায়ত্ব ঘুচে না, মানুষ পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

ফরাসী চিন্তাবিদ রুশো বলেছেন, "আমাদের জন্মকালীন ত্রুটি, পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, সে সবই পূরণ করে শিক্ষা।"[১] গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল বলেছেন, "অশিক্ষিত মানুষ অপেক্ষা শিক্ষিত মানুষ ঠিক ততটাই উৎকর্ষের অধিকারী, যতটা জড় অপেক্ষা জীব।"[২]

তাই আজ শিক্ষার অধিকার থেকে কোন মানুষকে বঞ্চিত করা মানেই তাকে আদিমতায় তথা পশুর স্তরে ঠেলে দেওয়া; শিক্ষাহীন মানব-আকৃতির প্রাণীতে পরিণত করা। যে-সমাজ কিংবা রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষকে সর্বাঙ্গীণ বিকাশোপযোগী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, সে-সমাজ ও রাষ্ট্র মানবিক হতে পারে না, মনুষ্যত্ব-সভ্যতা সংরক্ষণের সমাজ হতে পারে না কিংবা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে পারে না। ফলে একটা সভ্য, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজ দাবি করতে হলে কোন খোঁড়া যুক্তিতেই একজন মানুষকেও শিক্ষার মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। শিক্ষানীতির ভরকেন্দ্র এখানেই থাকা উচিত।

গণতান্ত্রিক শিক্ষা মানে সকলের জন্য শিক্ষা

সকল নাগরিকের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি গণতান্ত্রিক দায়িত্ব। এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটা বৈশিষ্ট্য। কারণ সকল নাগরিকের শিক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থায়িত্ব পায় না। সাধারণভাবে গণতন্ত্র বলতে বুঝায় জনগণের শাসন। শাসন-প্রশাসন কাঠামোতে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন ও শাসন-নীতি নির্ধারণে মতামত প্রদান, মত-পথের যাচাই-বাছাইসহ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারাকেই প্রকৃত জনগণের শাসন বলা হয়। অর্থাৎ জনগণের দ্বারা, তাদের পক্ষে ও কল্যাণে যে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাই গণতান্ত্রিক শাসন। বুর্জোয়া বিপ্লবের ঊষালগ্নে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদেরা এ-ধরনের কথাই প্রচার করেছিলেন।

উৎপাদন এবং বন্টনব্যবস্থাসহ রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ ও অধিকার চর্চা; অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থান-কাজ ইত্যাদি মৌলিক মানবাধিকারের সাংবিধানিক রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তাসহ সর্বমুখী বিকাশের অবারিত পথ চলতে পারার স্বাধীনতা ভোগ করাকে উচ্চতর গণতন্ত্র বলা হয়। যা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র অর্থাৎ সর্বহারা গণতন্ত্র হিসাবে বিবেচিত হয়।

কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থেও যদি জনগণের শাসন কিংবা জনপ্রতিনিধিত্বের শাসনের কথা বলি, তাহলে আমাদের দেশের ১৪ কোটি লোকের পক্ষে এক জায়গায় বসে মতামত গঠন করে সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সেজন্যই বাংলাদেশকে তিনশ' ভাগে ভাগ করে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো-আমাদের দেশের একশ' জন মানুষের মধ্যে ৬০ জন নিজের নাম লিখতে পারে না, তারা নিরক্ষর। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই জনগণ কি বাজেট বক্তৃতা বোঝে? সরকারের শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, কৃষিনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কোন ধারণা রাখে? নাকি শাসন-প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে কোন ধরনের ভূমিকা রাখতে কিংবা প্রভাব ফেলতে পারে? তাহলে এই জনগণের পক্ষে নিজেদের স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ ইত্যাদি বিবেচনা করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা কিভাবে সম্ভব?

আজকের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা একটি জটিল বিধি-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর পরিচালন ব্যবস্থা প্রকাশ্যে-গোপনে নানা কৌশলে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীস্বার্থ ও উদ্দেশ্যের সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত যা সাদা চোখে দেখা খুবই কঠিন। যেমন, সমাজের ভিত্তিমূলে অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়ম কার্যকর রয়েছে। একে বুঝতে হলে বুঝতে হবে উৎপাদন এবং বিলিবন্টন ব্যবস্থায় জনগণের কোন্ অংশ কোন্ সম্পর্কে কি নিয়মে জড়িত, কারা কতটুকু যোগান দেয় ও কতটুকু হিস্যা পায়। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে ঘাত-প্রতিঘাতে এর রূপ ও গতি-প্রকৃতি কখন কি দাঁড়াচ্ছে। উপরিকাঠামো তথা রাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সামাজিক আচার-সংস্কার ইত্যাদি কিভাবে গড়ে উঠছে, পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে উৎপাদনের বিকাশ ও সমাজ প্রগতিতে কারা কিভাবে ভূমিকা রাখছে তা সার্বিকভাবে বিবেচনা করে এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে খেয়াল রেখে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ কি অশিক্ষিত-নিরক্ষর জনগণের পক্ষে সম্ভব? তাহলে জনগণের মতামত, ইচ্ছা কিংবা স্বার্থ কিভাবে শাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত বা রূপায়িত হবে? কাজেই জনগণকে অশিক্ষিত রেখে গণতন্ত্র তথা জনগণের শাসন বা জনপ্রতিনিধিত্বের কথা বলা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।

একটা দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে গণতান্ত্রিক শাসনের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য ২৫ বছর যথেষ্ট সময়। কিন্তু আমাদের দেশের বুর্জোয়া শাসকদের কোন অংশই এ কাজটি নিষ্ঠার সাথে পালন করে নি বিধায় স্বাধীনতার ৩৩ বছর পরও শিক্ষার আলো ব্যাপক জনগণের জীবনকে আলোকিত করতে পারে নি। এ-যুগে বুর্জোয়াশ্রেণী জনগণের শিক্ষা ও সচেতনতাকে ভয় পায়। কেননা আজকের দিনে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার শাসকশ্রেণীর জনস্বার্থবিরোধী কাজের ক্ষেত্র সীমিত করে আনে। জনগণের উচ্চতর জ্ঞান ও শিক্ষা উঁচুস্তরের বিবেক ও সামাজিক চেতনা জন্ম দেয়, যা প্রথমে শোষিত জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তি নির্মাণ করে এবং অব্যাহত লড়াই সংগ্রাম ও মননের বিকাশ ধারায় সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের পথ প্রশস্ত করে। এটা বুর্জোয়াদের কাম্য নয়। সে জন্যই বুর্জোয়া-প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের উদ্দেশে লেনিন বলেছেন, "মন্ত্রীমহোদয় শ্রমিকশ্রেণীকে মনে করেন বারুদের স্তূপ এবং জ্ঞান ও শিক্ষা তাদের কাছে স্ফুলিঙ্গের সামিল। তিনি খুব ভালভাবেই বোঝেন যে ঐ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যদি বারুদের উপর পড়ে তা হলে যে-বিস্ফোরণটা ঘটবে তা সকলের আগে সরকারের বিরুদ্ধেই নিক্ষিপ্ত হবে।"[৩] ভারতীয় রেনেসাঁ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা রামমোহন বলেছিলেন, "স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলো সর্বদাই এ-কথা বোঝাতে চায় যে, জ্ঞানের প্রসার ঘটলে প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক কর্তৃত্বটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। কারণ তারা জানেন যে, মানুষ যদি একবার জ্ঞানের আলো পায় তাহলে তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, ব্যাপক মানুষের সংঘশক্তি মুষ্টিমেয় ক্ষমতাধিকারীর চাপিয়ে দেয়া জুলুমের জোয়ালটিকে উৎখাত করতে পারবে এবং সকল জুলুমের নিগড় থেকে মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে।"[৪] বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক টলস্টয় স্বৈরতান্ত্রিক জার সরকারসহ সকল স্বৈরাশাসককে মনে রেখে লিখেছিলেন, "জনগণের অজ্ঞতাই সরকারের শক্তির উৎস। সরকারও এটা জানে বলে সে সর্বদাই যথার্থ শিক্ষা বিস্তারে বিরোধিতা করে। আজ এই সত্যটা বুঝতে হবে।"[৫] আমাদের দেশে বিগত দিনে এবং বর্তমান সময়ে শাসকশ্রেণীর শিক্ষানীতি সংক্রান্ত মনোভাব থেকে একথা স্পষ্ট। ফলে আজ জগৎ ও জীবনের নিয়মসমূহকে সাধারণভাবে জানা, উৎপাদনের গতি বৃদ্ধি, সমাজের অসঙ্গতি দূর করার দক্ষতা ও শক্তি অর্জন করা এবং উচ্চতর মানবিক ও নৈতিক বোধের আধারে শাসনপ্রণালীতে জনগণের হিত-অহিতের বিষয় বুঝবার এবং বুঝানোর মতো শিক্ষার স্তরে সকল মানুষকে তুলে আনার উদ্দেশ্য সামনে রেখেই শিক্ষানীতি প্রণয়নের আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

এখানে আরেকটি বিষয়ও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার। চলা-ফেরার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা ইত্যাদিকে গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত বলা হয়। তাই, জনপদে কাউকে চলাফেরায় বাধা দিলে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখলে তা স্বেচ্ছাচারী কর্মকান্ডের মধ্যে পড়ে। তা হলে চিন্তার রাজ্যে

প্রবেশের অনধিকার বা প্রতিবন্ধকতা কি স্বৈরাচারী কাজের মধ্যে পড়ে না? অতএব জ্ঞান জগতের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় প্রতিটি মানুষকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করার সুযোগ না দিলে বুদ্ধির রাজ্যে স্বাধীনতা তথা চিন্তার স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে কিভাবে?

এ জন্যই সকলের জন্য সমন্বিত, মানবিক-উচ্চশিক্ষা অবারিত করতে না পারলে অর্থাৎ মুক্তবুদ্ধির চর্চা তথা জ্ঞানের রাজ্যে সকল শাখায় অবাধে স্বাধীনভাবে জনসাধারণকে চলতে ফিরতে পারার ক্ষমতা অর্জন করার স্তরে তুলতে না পারলে প্রকৃত গণশাসন হয় না। যদিও সে-অর্থে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার উপযোগী শিক্ষা আজকের দিনে বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে আশা করা বৃথা। শুধু তাই নয়, এই অধিকার-চেতনা ও তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যও কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করে যেতে হবে।

শিক্ষা মানুষকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ করে

প্রকৃতির বাইরের আকার-আকৃতি শোভা-সৌন্দর্য যারা চোখে দেখতে পায় না, তারা দৃষ্টিহীন। যারা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিয়ম-নীতি, সম্পর্ক-সম্বন্ধের গতি-প্রকৃতি দেখতে পায় না কিংবা অনুধাবন করতে পারে না তারা অধিক দৃষ্টিহীন। অর্থাৎ চোখ থাকতেও অন্ধ। চোখের অন্ধত্বকে অতিক্রম করে আজকের মানুষ শিক্ষায়-কর্মে বাঁচতে পারে, এগুতে পারে, যদি রাষ্ট্রীয় সামাজিক পরিচর্যা পায়। কিন্তু অজ্ঞানতার অন্ধত্ব নিয়ে এ যুগে প্রাণীমানুষ বাঁচলেও 'স্বাধীন মানুষ' হিসেবে বাঁচা চলে না।

হাত-পা যথেচ্ছ ছুঁড়তে পারাকেই স্বাধীনতা বলে না। স্বাধীনতা হলো জ্ঞানের বিশেষ অর্জন, নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের সঠিক ধারণা। প্রকৃতির অন্ধ শক্তি, সামাজিক অনাচার, শোষণের শক্তি, রিপুর তাড়না ও ইন্দ্রিয় শক্তিকে নিয়ম-নীতি জ্ঞানে, সমাজের বৈপ্লবিক বিকাশ চাহিদার প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত ও জয় করার মধ্য দিয়ে দশের মাঝে এক হয়ে চলতে পারা, বাঁচতে শেখার নাম স্বাধীনভাবে বাঁচা। একদিন আকাশে বিজলী চমকালে মানুষ ভয় পেয়ে গুহায় লুকাতো। জপ-তপ করতো। অর্থাৎ প্রকৃতির শক্তির কাছে মানুষ ছিল অসহায়। সে-অর্থে সে ছিল প্রকৃতির অধীন। আজ বিজলীর শক্তিকে মানুষ তারে বন্দি করে আলো জ্বালে, পাখা চালায়, আরো কত কাজে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করে। এখানে এতটুকু অর্থে মানুষ প্রকৃতির অধীনতামুক্ত অর্থাৎ স্বাধীন।

সামাজিক দিক থেকে দাসেরা ছিল দাস-মালিকের অধীন। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধীনতামূলক দাসব্যবস্থা ভেঙে মানুষ স্বাধীন হয়ে উঠলো। কিন্তু সত্যিকারের স্বাধীনতা এলো না। সামন্তব্যবস্থায় ভূমিদাসেরা হলো নতুনভাবে পরাধীন। বৈষয়িক ও ভাবগত উৎপাদনের পথ হলো রুদ্ধ। সামন্তবাদী ব্যবস্থা বিপ্লবের আঘাতে ভেঙে দিয়ে মানুষ আবার হয়ে উঠলো স্বাধীন। পুনর্বার পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মজুরী-দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়লো মানুষ। এ-দাসত্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আঘাতে ভাঙা হয়েছিল। অনেক স্থানে তা টিকতে পারে নি, তবে আবারও ইতিহাসের নিজস্ব নিয়মে মানুষ তা ভাঙ্গবে এবং স্বাধীন হয়ে উঠবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থায় মানুষকে যেতে হবে। কারণ শ্রেণীহীন, শোষণহীন আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দাঁড়িয়েই ভিতরের ও বাইরের প্রকৃতির উপর মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকামী নিয়ন্ত্রণ-সাধনা সীমাহীন বিস্তারে প্রসারিত হতে পারে। জ্ঞানের সর্বোচ্চ শানিত হাতিয়ার নিয়ে বিশ্বের সকল মানুষ এক পরিচয়ে বিশ্ব প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে। প্রতিটি মানুষ মাত্রই হতে পারে সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনে ও নিয়ন্ত্রণে এক একজন স্রষ্টা।

লেনিন বলেছিলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের চেতনা বহির্ভূত প্রাকৃতিক নিয়ম যা স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করে সে সম্পর্কে জানতে না-পারি, ততক্ষণ পর্যন্ড় আমাদেরকে 'অন্ধ প্রয়োজনের' দাসত্ব করতে হয়। কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তানিরপেক্ষভাবে ক্রিয়াশীল এ নিয়ম (যা মার্কস সহস্রবার উল্লেখ করেছেন) একবার জানতে পারলে, আমরা প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি।"[৬] ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বলেন, "প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখলেই স্বাধীনতা অর্জিত হয় না। বরং প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কিত জ্ঞান দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। কারণ এ জ্ঞান নিয়মানুসারে প্রকৃতিকে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরি করে। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম এবং যে-সব নিয়ম আমাদের শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করে উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ দু'শ্রেণীর নিয়মকে আমরা ভাবনায় পৃথক করলেও বাস্তবে তা নয়। কাজেই ইচ্ছার স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। সুতরাং কোন একটা সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত মানুষের স্বাধীন চিন্তা অর্জনের জন্য সে বিষয়ের নিয়ম-নীতি বিচারপদ্ধতি অনেক বেশি জরুরি। সে কারণে স্বাধীনতা মানে প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কিত জ্ঞানের দ্বারা ভিতরের প্রকৃতি ও বাইরের প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, ...।"[৭]

প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা মানুষকে বিচ্ছিন্ন রাখে, কিংবা পশুপালের মতো উদ্দেশ্যহীন জটলা-জমাটে ধরে রাখে। আবার অজানা আতংক, তাৎক্ষণিক বিভ্রান্তি কিংবা মোহে বিশৃঙ্খল করে তোলে। সমাজের সঙ্গতি ও ভারসাম্য বিনষ্ট করে, অগ্রগতি ব্যাহত করে।

আজকের সমাজের অসঙ্গতিগুলি আমরা দেখছি। কিন্তু এ-অসঙ্গতি দূরীকরণের লক্ষ্যে সামাজিক ঐক্য গড়ে উঠছে না। কারণ, সমাজ ও জীবনের সামনে উপস্থিত সমস্যার অন্তর্নিহিত নিয়মসমূহ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কিত সত্য জ্ঞান অর্জনকারী মানুষ ছাড়া আজ সত্যিকারের প্রগতির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ-ঐক্যই বৈষম্যমূলক সকল অসঙ্গতি দূরীকরণের সামাজিক বৈপ্লবিক শক্তির জন্ম দেবে। এটা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, সকল অন্যায়-অসঙ্গতির বিরুদ্ধে একই উদ্দেশ্য নিয়ে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত শিক্ষা। এ শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানব ঐক্য কার্যকর শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

শিক্ষার মাধ্যমে মানবমিলনের যে সেতুবন্ধন তৈরী হয় তা শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, আন্তর্জাতিক পরিসরে তথা বিশ্ব মানব পরিমন্ডলেও কার্যকর হয়। ফলে যথার্থ শিক্ষা ব্যতীত সমাজ বন্ধন, সামাজিক ঐক্য, শ্রেণী সচেতনতা, শ্রেণী ঐক্য, জাতীয় ঐক্য, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী মানব ঐক্য-কোনটাই যুক্তিশীল বিকাশকামী হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। আজ আমাদের শোষণমুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশের লক্ষ্যে শোষিতশ্রেণীর ঐক্যের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ, পুঁজিবাদ বিরোধী বিশ্ব মানব ঐক্যের পথে এগুনো দরকার। ফলে বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর চিন্তা ও জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের শিক্ষার নীতি-পদ্ধতি ঠিক করতে হবে।

শিক্ষা জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির পরিচালিকা শক্তি

শিক্ষিত মানুষ মানেই দক্ষ মানুষ। উচ্চশিক্ষিত মানুষ মানে অধিক দক্ষ মানুষ। এ দক্ষতার মধ্য দিয়েই মানুষ অর্জন করে প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ্য ও লুক্কায়িত শক্তি-সম্পদ আহরণের বিপুল ক্ষমতা। যতো উঁচু স্তরের শিক্ষা মানুষ লাভ করে, ততো তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা বেড়ে চলে। ফলে এক লক্ষ মানুষকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে প্রাকৃতিক-সামাজিক নিয়ম-নীতি আবিষ্কার উদ্ভাবনের সামাজিক পটভূমি নির্মাণ করতে যে টাকা খরচ হয়, একজনের একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই তার সহস্রগুণ বেশি আয় এনে দিতে পারে। কারণ সম্পদ এবং মূল্য দুটোই শ্রমের ফলাফল মাত্র। ফলে দক্ষ শ্রম মানেই অধিক সম্পদ ও আরো অধিক সম্পদ আহরণের উপায়।

১৯২টি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যালোচনা সম্বলিত বিশ্বব্যাংকের ১৯৯৫ সালের দলিলের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম লিখেছেন, ''বিশ্বে মোট সম্পদের বিভিন্ন ধরনের পুঁজির অবদান হলো ভৌত পুঁজি ১৬ শতাংশ, প্রাকৃতিক পুঁজি ২০ শতাংশ এবং মানব ও সামাজিক পুঁজি ৬৪ শতাংশ। অর্থাৎ যে কোন দেশে সম্পদ সৃষ্টিতে মানব ও সামাজিক পুঁজি গঠনের প্রসারমান বিনিয়োগের তেমন কোন বিকল্প নেই। আর সেই মানব সম্পদ গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলা যায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-খাতে পরিকল্পিত বর্ধিত সম্পদ বিনিয়োগ শেষমেশ দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে বড় ধরনের অবদান রাখে। তাই পৃথিবীতে আজ শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি আসন দখল করে নিয়েছে।"[৮]

নোবেল বিজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ থিওডোর শুলট্জ্ তাঁর গবেষণায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন, ''(১) গত তিন দশকে (১৯৫৭ পর্যন্ত) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তার জন্য যন্ত্রপাতি বা দালানকোঠা ইত্যাদির তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবদান অধিকতর। (২) ১৯০৯ থেকে ১৯২৯ সাল সময়কালে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা যে-ভূমিকা পালন করে সে তুলনায় বর্তমানে শিক্ষার ভূমিকা অনেক বেশি। (৩) ১৯০৯ থেকে ১৯২৯ সালে উন্নয়নে শিক্ষার চেয়ে বিনিয়োজিত দ্রব্যসামগ্রীর অবদান দ্বিগুণ ছিল, কিন্তু ১৯২৯ থেকে ১৯৫৯ সালে শিক্ষার অবদান দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিকতর ছিল।"[৯] অপর এক মার্কিন অর্থনীতিবিদ এডওয়ার্ড ডেনিসনের গবেষণা মতে "১৯২৯ - ১৯৫৭ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ২১ ভাগই ছিল শিক্ষার অবদান।"[১০]

লেনিনগ্রাদের ধাতু শিল্পে কর্মরত একদল শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার ভূমিকার উপর এককালের সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ এস জি স্ট্রুমিলিনের গবেষণায় দেখা যায়, "(১) মাত্র এক বছরের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সাধারণ সাক্ষরতা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করে। অপরদিকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর রেঞ্চ বা 'লেদ মেশিন' চালকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এক বছরের কর্মকালীন শিক্ষা তাদের কর্মদক্ষতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে মাত্র বছরে ১২ থেকে ১৬ শতাংশ অর্থাৎ কারখানায় কর্মরত নিরক্ষর শ্রমিকদের তুলনায় এমন কি এক বছরের সাধারণ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ; (২) সম্পূর্ণ নিরক্ষর শ্রমিকদের চেয়ে চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের উৎপাদনক্ষমতা ৪৩% বেশি। মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের ১০৮ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তদের ৩০০ শতাংশ বেশি।" ১৯৬২ সালে এক নিবন্ধে তিনি আরও বলেন, "১৯৬০ সালে মোট জাতীয় আয় (প্রচলিত মূল্যমানের ভিত্তিতে) ছিল ১৪৬.৬ বিলিয়ন রুবল। (পরে এই আয়ের পরিমাণ সংশোধন করে ১৪৫ বিলিয়ন রুবল ধরা হয়।) এই আয়ের ২৩ শতাংশের উৎসমূল হলো জনগণের উন্নতমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা।

... .. ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি শিক্ষার ফলে শ্রমের উৎপাদন বৃদ্ধির একটি চাবিকাঠি বলে মনে করা হয়। এই সময়সীমায় স্থিতিশীল মূল্যে সোভিয়েত জাতীয় আয় ৩৩.৫ বিলিয়ন রুবল থেকে ১৪৬.৬ বিলিয়ন রুবলে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৩৩৮ শতাংশ। ... .. ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে বস্তুগত উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৫৫.৭ বিলিয়ন রুবল থেকে ১৭৪ বিলিয়ন রুবল-এ (অর্থাৎ ৩০০ শতাংশ)। এ সময় শিক্ষায় বিনিয়োগের বৃদ্ধি হয় ৩২৯ শতাংশ। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার অগ্রগতির ফলে জাতীয় উৎপাদন প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৬২৬ শতাংশ (অর্থাৎ ছয় গুণেরও বেশি)। সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, বিনিয়োজিত পুঁজির উপর লাভের হারের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষায় বিনিয়োগের লাভই সর্বাপেক্ষা বেশি। এই লভ্যাংশ ১৯৪০ সালের ৫২ শতাংশ থেকে ১৯৬০ সালে ১৪৪ শতাংশে উন্নীত হয়।

মস্কো রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের রেক্টর ভি. এ. জামিন, স্ট্রুমিলিনের গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে প্রবর্তিত বেতনের ভিত্তিতে এক সমীক্ষা পরিচালনা করেন। এ সমীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬২ সালে জাতীয় আয়ের প্রায় ২৭ শতাংশ আসে শিক্ষায় বিনিয়োগ ও তার ফলে শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উন্নতি থেকে। ... .. আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, সাধারণ শিক্ষামানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ত্রুটিমুক্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার কারণে ক্ষতির হারও হ্রাস পায়।

... .. জাপানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষা থেকে দেখা যায়ঃ ১৯৬০ সালে শিক্ষায় বিনিয়োজিত পুঁজি বস্তুগত পুঁজির ১৮ শতাংশ ছিল, কিন্তু শিক্ষায় বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভ আনুপাতিক হারে অধিক ছিল। ১৯৩০ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ২৫ বছরে জাতীয় আয়ের বর্ধিত অংশের ২৫ শতাংশ ছিল শিক্ষায় বিনিয়োজিত মূলধনের অবদান। ... .. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপান; আধুনিক যুগের এই তিনটি শিল্পোন্নত দেশের ঐতিহাসিক পটভূমি, ভৌগলিক অবস্থান, সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও তিনটি দেশেই অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্যে শিক্ষার বিনিয়োগের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়।"[১১]

সমাজতান্ত্রিক সমাজবিকাশের ইতিহাস হতে দেখা যায়, শিক্ষা যত উঁচু স্তরের মানবিক চরিত্র বিকাশের ও সামাজিক চেতনার সাথে যুক্ত হয়-ততই মানুষের জ্ঞান সৃষ্টিধর্মী, আদর্শমুখী ও মানব কল্যাণকামী তো হয়ই, অর্থনৈতিক অগ্রগতিকেও বিস্ময়কর গতিতে ত্বরান্বিত করে।

তাই দেখা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ধিত রাষ্ট্রীয় ব্যয় বরাদ্দ তার চেয়েও বহুগুণে সম্পদ-সমৃদ্ধি ও বহুবিধ মানবিক অর্জনের রূপে ফিরে আসে। এ বিবেচনা থেকেই শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ব্যয় বরাদ্দের যৌক্তিকতা গৃহীত হয়ে এসেছে। যদিও আজকের দিনে বুর্জোয়া সরকারগুলো নানা অজুহাতে বিকাশের অপরিহার্য শর্ত শিক্ষার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে অস্বীকার কিংবা উপেক্ষা করে চলছে। বাঁধ দেওয়া দেয়ালের ছোট্ট ফাটলের ফাঁক গলিয়ে পানি ঝরতে ঝরতে এক সময় যেমন করে গোটা বাঁধ ভেঙে পড়ে; তেমনি 'শিক্ষার্থীদের উপর সামান্য কিছু ব্যয়ের বোঝা না চাপালে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে, শিক্ষার গুণ-মান নষ্ট হবে'-এই সব যুক্তি করতে করতে আজ শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ধনিকশ্রেণীর পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। বিশ্বচরাচরব্যাপী মুক্ত চিন্তা অর্জনের ক্ষমতা ও শক্তিকে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মুক্তবাজার অর্থনীতির মুক্ত পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। গরীব শ্রমজীবী মানুষদের পেশীকোষ ও মস্তিষ্ক কোষকে সমপর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে।

অজ্ঞতা হতাশার জন্ম দেয়, অবসাদগ্রস্ততা-স্থূলতা ও বৈকল্য সৃষ্টি করে। শিক্ষা নব নব উদ্দীপনা ও আনন্দের খোরাক জোগায়। যতো তাড়াতাড়ি আমরা জীবন মানের উন্নতি চাই, অভাব-দারিদ্র্য-বেকারত্ব ও অনিশ্চয়তার অভিশাপমুক্ত জীবন চাই, ততো দ্রুত শোষণমুক্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা নির্মাণের চেতনা ও সংগ্রামের আধারে উচ্চশিক্ষায় দেশের সকল লোককে শিক্ষিত করা চাই। এর বিকল্প নেই।

প্রচলিত ব্যবস্থার অর্থেও যদি ভাবি তা হলে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলি থেকে আমরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-কৃৎকৌশলে অনেক পিছিয়ে আছি। মাথাপিছু আয়ের বিচারে ১ জন জাপানীর সমান ১৪০ জন বাংলাদেশী। এখন এদের উচ্ছিষ্ট হাত পেতে নিয়ে আমরা কোনদিন তাদের সমকক্ষ হওয়া তো দূরে থাক, টিকে থাকাই দুষ্কর হবে। কারণ পুঁজিবাদী দুনিয়া পারস্পরিক সহযোগিতার নয়, মারমুখী প্রতিযোগিতার দুনিয়া। তাই আমেরিকাতে যদি শতকরা ৯০ জন উচ্চশিক্ষিত লোক থাকে আমাদের ১০০ জনকেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। অথচ আমাদের দেশের শাসকদের ভাবনা-ধারণা ঠিক উল্টো দিকে প্রবাহিত।

অনেকে যুক্তি করেন, সবাই উচ্চশিক্ষিত হয়ে গেলে রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া, ময়লা পরিষ্কার করা কিংবা গতর খেটে কৃষিকাজ, মুটের কাজ এগুলো করবে কারা? শ্রমের মর্যাদার ধারণা এদেশের সমাজমূলে কখনও গভীরভাবে প্রোথিত হয় নি। তাই শিক্ষাটা হয়ে আছে সুবিধার হাতিয়ার কিংবা শ্রমবিমুখ পরগাছাসুলভ মানসিকতার অবলম্বন। নইলে ভাবনার গতিটা এই দিক দিয়ে যাবে কেন? তা ছাড়া উচ্চশিক্ষিত লোক যদি কৃষিকাজ করে, তাহলে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি মান্ধাতার আমলে পড়ে থাকতে পারে না।

আমাদের দেশের একজন কৃষিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেছেন, "... .. সাধারণ শিক্ষা যেমন বৃটিশরাজ আম জনসাধারণের জন্য চালু করলেন না তেমনি কৃষি শিক্ষাও কৃষকদের জন্য চালু করা হয়নি। ... .. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকায় খোদ কৃষকদের শিক্ষার নিমিত্তেই ল্যান্ডগ্র্যান্ট কলেজ (কৃষি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ইউরোপে কৃষি শিক্ষা ইনিষ্টিটিউটগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেগুলোতে ভর্তির প্রাথমিক সুযোগ খোদ কৃষকদের। ... .. আমাদের দেশের ভৌগলিক অবস্থান, আবহাওয়া, জমি ও মানুষের কারণে কৃষি উৎপাদনের গুরুত্ব আগামী শতকে শতগুণ বাড়বে। ... .. মানুষের জ্ঞানভান্ডারে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে, আমাদের ভবিষ্যৎ কৃষকদের সরাসরি তার সাথে যুক্ত করতে পারলে আগামী শতাব্দীতে বর্তমান শতাব্দীর উন্নত ও ধনী দেশগুলোর চাইতে অনেক বেশি সফল হবার অনিবার্য সম্ভাবনা রয়েছে। একটি মাত্র শর্ত। কৃষকদের সাধারণ শিক্ষায় আগে শিক্ষিত করে তোলা, যাতে তারা কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে। এজন্য চাই সর্বজনীন বিজ্ঞানমনস্ক সাধারণ শিক্ষা। এরপর সরাসরি কৃষককে কৃষি শিক্ষা। ... .. গরু ও লাঙ্গল দিয়ে চাষ করি, খড়ের তৈরি গোয়ালে গবাদিপশু লালন-পালন করি, কিংবা খাল-বিলের মাছ ধরে খাই, ফলে আমাদের কৃষি প্রাগৈতিহাসিক কালের এই খেদ করে লাভ নেই। আমাদের লাঙ্গল, জোয়াল, গোয়ালঘর আর পশ্চিমের ট্রাক্টর-কম্বাইন পশু র‍্যাঞ্চ একই সাথে সেকেলে ও বাতিল হয়ে যাচ্ছে। তাই কনভয়ের বেল্টযুক্ত ভারী শিল্প-যুগে না ঢুকে যেমন ইলেকট্রনিক-সাইবারনেটিক যুগে প্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তেমনি সুযোগ এসেছে সরাসরি আধুনিক কৃষি যুগে প্রবেশ করার। এজন্য সরাসরি কৃষকদের কৃষি শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসতে হবে। ... .. শিক্ষার সকল আয়োজন ও ব্যয়ভার বহন করবে রাষ্ট্র।"[১২] এভাবে ঝাড়ু দেওয়াসহ অধঃস্তন কায়িক শ্রমের প্রচলিত পদ্ধতিও শিক্ষার উঁচু সোপান বেয়ে পাল্টে যেতে বাধ্য। কারণ উচ্চশিক্ষা গভীর জ্ঞানের আকর। তা একদিকে যেমন সৃষ্টির আকুতি তৈরি করে, তেমনি অনেক বেশি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধেরও জন্ম দেয়।

উচ্চশিক্ষা তো পরের কথা, একটা সময় ছিল যখন প্রাথমিক শিক্ষাও সকল মানুষকে দেওয়ার ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠী জনমনে দ্বিধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কতো প্রয়োজন যে সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সেদিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রী লোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কিনা, এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যে বেহারা বসিয়া বসিয়া পাখা টানিবে তার পক্ষে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি কাজের, যে গোরু ঘানি ঠেলিবে তার পক্ষে খোলা আকাশের চেয়ে চোখের ঠুলিই বড় সহায়, এ কথা সহজেই মনে আসে। যে দেশে একই চক্রে ঘানি ঠেলাটা সবচেয়ে বড় কাজ সে দেশের বিজ্ঞ লোকেরা আলোটাকে শত্রু মনে করিতে পারেন। কিন্তু দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড় করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরো বড় কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে

মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়। ... .. আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই, তার চলা-ফেরার পথ খোলাসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না।"[১৩]

১৯২০-২১ সালের দিকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বাংলাদেশের বহু সংখ্যক জমিদারের মনোভাব ছিল এরূপ, "১. চাষীর ছেলের রোদ-বাতাস সহ্য করার ক্ষমতা চলে যাবে; ২. ঐ ছেলে পিতার কাজকে অর্থাৎ চাষীকে ঘৃণা করতে শিখবে; ৩. চাকর-বাকর নষ্ট হয়ে যাবে; ৪. চোখ খুলে যাবে, দারিদ্র্য বেশি করে উপলব্ধি করবে এবং দূরীকরণের জন্য সংগ্রাম শুরু করবে; ৫. চাষী যদি পড়তে আরম্ভ করে ও ভাবতে আরম্ভ করে তাহলে নীতিহীন প্রচারকের পাল্লায় পড়বে।"[১৪] পরাধীন যুগের সেই অন্ধকার এখনও আমাদের মন থেকে দূর হয় নি।

অবক্ষয়ের কালে পুঁজিবাদের পথে এগুবার যে চেষ্টা শাসকশ্রেণী করছে, তার ফলে এবং শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে আজ আমরা আলপিন থেকে এরোপ্লেন পর্যন্ত সবই বিদেশ থেকে আমদানি করি। পৃথিবীর মানুষ যখন মরুর বুকে ফসল ফলাচ্ছে আর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নিচু জমিতে বাঁধ দিয়ে বসবাসের উপযোগী করছে তখন নদীমাতৃক এই দেশে বারো মাসের মধ্যে আমরা একবার বানের জলে ভাসি তো আরেকবার খরায় পুড়ে মরি। তার উপর ভূ-গর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত ব্যবহারে এখন আর্সেনিক বিষে তিন থেকে চার কোটি মানুষ আক্রান্ত। নদী ভাঙ্গন-বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে এখনও বিদেশী প্রযুক্তি-পরিকল্পনার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। সামান্য ব্রীজ নির্মাণের জন্য বাইরের দেশের প্রকৌশলী ভাড়া করতে হয়। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও ধান-পাট ইত্যাদি গবেষণার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ ভাড়া করতে হয়। পাট থেকে চট তৈরির মধ্যেই আমরা এখনও আটকে আছি। শাসকগোষ্ঠীর সে ইচ্ছেও আর নেই, রাষ্ট্রীয় অবহেলায় একের পর এক পাট-বস্ত্র-সুতা কল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেশের বৃহত্তম পাটকল আদমজী-কে আধুনিকায়নের পরিবর্তে কথিত লোকসানের অজুহাত তুলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ পাট থেকে পাল্প-কাগজ, জিওটেক্সটাইল, সেলুলোজ কার্বন ফাইবার, মাইক্রোকিষ্টাইন, বিবিধ সেলুলোজ ডেরিভেটিভ, কম্পোজিট মেটেরিয়াল, কার্পেট, চপ্পল ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হয় নি। জাতীয় স্বার্থকে বিপন্ন করে তেল-গ্যাসসহ দেশের সম্পদ বিদেশীদের কাছে ইজারা দিতে হচ্ছে।

এ ধরনের হাজারো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কতো বড় সর্বনাশ দেশের জন্য! তারপরও এ-সবই মেনে নিতে হচ্ছে শাসকদের পক্ষ থেকে হাজির করা 'আমাদের দক্ষতা-যোগ্যতা নেই' যুক্তিকে শিরোধার্য করে! স্বাধীনতার পর থেকে সকল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করা এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার সর্বাত্মক উদ্যোগ নিলে আজ এ দুর্গতি হতো না। শাসকগোষ্ঠী মানুষকে বুঝাতে চায় সবাইকে শিক্ষিত করা এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য এত টাকা কোথায়? এ একই ধরনের যুক্তি যখন ইংরেজ আমলে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা দেবার বেলায় করা হতো, তখন তার জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "দেশ জোড়া অতিবিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জন করতে অর্থে কুলোয় না, অর্থাৎ যে-সব অভাবে দেশ অন্তরে-বাহিরে মৃত্যুর তলায় তলাচ্ছে তার প্রতিকারের অতি ক্ষীণ উপায় দেউলে দেশের মতোই; অথচ এ দেশে শাসনব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্য ধনী দেশকেও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ... .. দেশকে শিক্ষা দেওয়া স্টেটের গরজ, ইহা তো অন্যত্র দেখিয়াছি। এই জন্য য়ুরোপে-জাপানে-আমেরিকায় শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের গরীব দেশেই শিক্ষাকে দুর্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তোলাতেই দেশের মঙ্গল, এ কথা উচ্চাসনে বসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেসুর ততই উচ্চসপ্তকে উঠিবে।"[১৫]

আমাদেরও শিক্ষার জন্য টাকার অভাব! অথচ ৬০ হাজার কোটি কালো টাকা, ২২ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ লুটেরা ধনীদের হাতে রয়েছে। 'গত ২৭ বছরে (ক) শিল্প বিরাষ্ট্রীয়করণ, (খ) ব্যাংক-বীমা (গ) উপজেলা পরিষদ-এ তিনটি খাতে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে ৫৪ হাজার কোটি টাকা।'[১৬] এ টাকা উদ্ধার করতে বাধা কোথায়? ঘুষ-দুর্নীতিসহ সহস্র কোটি শ্রমঘন্টার অপচয়, অপব্যয়, অপরিকল্পিত বিনিয়োগ, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি ইত্যাদিতে হাজার হাজার কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে। 'শুধুমাত্র ৯টি মন্ত্রণালয় ২৩ বছরে অপচয় করেছে ২৫০৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। সরকারের পাওনা উদ্ধার করতে পারে নি ১১০৯৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা।'[১৭] কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাস্তার মাঝখানে রোড-ডিভাইডার ভাঙা-গড়ার খেলা চলে। ছয়শ' কোটি টাকা খরচ করে ফ্রিগেট, আটশ' কোটি টাকায় মিগ যুদ্ধবিমান কেনা কি উদ্দেশ্যে? সামরিক খাতসহ অনুৎপাদক খাতে ব্যয়-বরাদ্দের কোন যুক্তি আছে কি?

আমাদের সরকারগুলো এ কথা অবিরাম বলে যাচ্ছে যে তারা শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিচ্ছে। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, সবাই এই কৃতিত্ব দাবি করে। অথচ এটি একটি শঠতাপূর্ণ প্রচার মাত্র। তা আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত 'বাংলাদেশের বাজেটে অনুৎপাদনশীল খাতসমূহের রাজস্ব ব্যয় বনাম মানব উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনারের বক্তব্যে। দেশের বরেণ্য দুইজন অর্থনীতিবিদ মইনুল ইসলাম এবং আবুল বারকাত কর্তৃক উপস্থাপিত ধারণাপত্রে বলা হয়, "গত পঁচিশ বছরে আমাদের দেশে এমন কোন সরকার আসেনি যে উচ্চস্বরে দাবি করেনি যে, 'আমরা এবার শিক্ষা খাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি'। অথচ এটা মিথ্যা কথা। ... ১৯৭২ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ গত প্রায় তিরিশ বছরে মোট রাজস্ব ব্যয় হয়েছে ১,৫৭,০৯৩ কোটি টাকা যেখানে শীর্ষস্থানে আছে সাধারণ প্রশাসন (১৯.৯%), দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে প্রতিরক্ষা (১৭.৬৪%), তৃতীয় স্থানে শিক্ষা ও ক্রীড়া (১৭.৪৮%, শুধু শিক্ষা নয়-ক্রীড়াসহ শিক্ষা, যেখানে শিক্ষা বাজেট জনগণের শিক্ষার লক্ষ্যে ছিল কিনা সেটা বিশেষ বিশ্লেষণের দাবিদার), চতুর্থ স্থানে ঋণ পরিশোধ (১২.৬৩%, যে ঋণের ৭৫% জনগণের কাছে পৌঁছেনি), পঞ্চম স্থানে-পুলিশ ও বিচার (৮.২১%, বাংলাদেশে ৬৫ লক্ষ মামলা বিচারের রায়ের অপেক্ষায় আছে) এবং ষষ্ঠ স্থানে-অন্যান্য (৫.৮১%, যার ব্যাপকাংশ কোন অর্থেই মানবউন্নয়নমুখী নয়)। ... শিক্ষা বাজেটে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্ট শিক্ষার অংশ, ক্রীড়া বাজেটে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ার অংশ, স্বাস্থ্য বাজেটে প্রতিরক্ষায় নিযুক্তদের অংশ, ঋণ পরিশোধের সাথে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্টতার অংশ-এসব কোনভাবে আলাদা করে দৃশ্যমান প্রতিরক্ষার সাথে যুক্ত করলে সেটা ১৭.৬৪ শতাংশ থেকে কমপক্ষে ৩০ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা খাতটিই হবে রাজস্ব বাজেটের প্রকৃত সর্বশীর্ষ খাত।" ঐ ধারণাপত্রে আরও বলা হয়, যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান ক্রয় করা হয়েছে তা দিয়ে ১৫ হাজার প্রাথমিক স্কুলের প্রয়োজনীয় শিক্ষক ২০ বছরের জন্য নিয়োগ করা যেতো।[১৮]

এই সামরিক শক্তি দিয়ে কি আমরা পাট-সুতা-বস্ত্র শিল্পগুলো রক্ষা করতে পারলাম? আদমজী জুট মিল রক্ষা করতে পারলাম? তেল-গ্যাস সম্পদ রক্ষা করতে পারলাম? এখন কি সেই দিন আছে-আমাদের মতো দেশের অর্থনীতিকে স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্ত ভিতের উপর না দাঁড় করিয়ে এবং জনগণকে সামরিক আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত না করে শুধু প্রাগৈতিহাসিক কনভেনশনাল সামরিক শক্তিতে অস্তিত্ব রক্ষা করা? ১৯৬০-এর দশকের ভিয়েতনাম এবং সাম্প্রতিক ইরাকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া সহায়-সম্পদে প্রাচুর্যহীন ছোট্ট দেশ কিউবার কথাই ধরা যাক। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষার শক্তিতে দাঁড়িয়ে মহাশক্তিধর আমেরিকার ক্রোড়ে একটানা বাণিজ্যিক অবরোধ-চক্রান্ত ও আক্রমণের হুমকির মুখেও অটল থেকে সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে। কাজেই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

আধুনিক শিক্ষা মানে সেক্যুলার শিক্ষা

শিক্ষার নীতিগত প্রশ্নের সাথে শিক্ষার বিষয়বস্তুর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগত প্রশ্নটি জড়িত। কেননা, শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ সমাজজীবন ও বস্তুজগতকে কি ভাবে দেখবে, কি ভাবে বুঝবে, উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি প্রায়োগিক ক্ষমতা-দক্ষতা কতখানি অর্জন করবে তা নির্ভর করে শিক্ষার বিষয়বস্তুর উপর।

আমরা বস্তুর নিয়ম ও গুণ দ্বারা বস্তুর বিচার করবো, নাকি পূর্ব নির্ধারিত কোন নির্বিশেষ সিদ্ধান্ত, ধর্মীয় কিংবা প্রথাগত অন্ধবিশ্বাস বা মনগড়া কোন ধারণার ভিত্তিতে জগত-জীবনকে বুঝবো? পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে জ্ঞানের ভিত্তি না অতিপ্রাকৃত অলৌকিক কোন কল্প-কাহিনী? বুর্জোয়াশ্রেণীকে একদিন এসব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আধুনিক সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল। স্থবির সামন্তীয়-আঞ্চলিক অর্থনীতি ভেঙে অধিক মুনাফার ক্ষেত্র নির্মাণের তাগিদেই বুর্জোয়াশ্রেণীকে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ তথা শিল্প বিপ্লব, কৃষি বিপ্লব সাধন করতে হয়েছিল। সেজন্য বিজ্ঞান চর্চা ছিল অপরিহার্য। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী-মানবতাবাদী ভাবাদর্শের ভিত্তিতে তারা যে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিল, সে-সংগ্রাম থেকেও বিজ্ঞান নির্ভর সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রশ্নটি বিচ্ছিন্ন ছিলো না। তাই ফরাসী বিপ্লবের সেদিনকার স্রষ্টারা জ্ঞানচর্চাকে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস লিখেছেন, "মহান মানুষেরা, যারা আসন্ন বিপ্লবের জন্য ফ্রান্সের মানুষের মননকে প্রস্তুত করেছিলেন, তাঁরা নিজেরাই ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী। তারা বাইরের কোন শক্তির কর্তৃত্বকে স্বীকার করেন নি। তখন ধর্ম, প্রকৃতি বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠান সকল কিছুকেই তীব্র সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়েছিলঃ কোন বিষয়ের অস্তিত্বশীলতা অথবা অস্তিত্বহীনতা অবশ্যই কেবল যুক্তির বিচারে নিরূপিত হতো। যুক্তি হয়ে ওঠে সকল বিষয় অনুধাবনের মূল মানদন্ড।"[১৯]

কিন্তু আজ বুর্জোয়াদের কাছে যুক্তি নয়; অন্ধবিশ্বাস ও আনুগত্য প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তারা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার জন্য লড়াইটা আর করতে পারে না। যারা এই বুর্জোয়া শোষণ-শাসন থেকে সভ্যতা মুক্ত করতে চাইছেন, আজকে ধর্মনিরপেক্ষ (secular) শিক্ষার জন্য লড়াইটা তাদেরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। তাই এই লড়াইটা তাদেরকেই প্রধানত করতে হবে।

সেক্যুলার (secular) শব্দটির অর্থ অভিধানে লেখা আছে, Worldly rather than spiritual. Not related to religion, not living in a religious community, (পার্থিব; আধ্যাত্মিক নয়। কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়)। সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি বলতে আমরা বুঝি, নিয়মশাসিত বস্তুজগত যেমন আছে তেমনভাবে তাকে দেখা, তার নিয়মসমূহকে উদ্ঘাটন করা এবং তার গুণাগুণকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে কাজে লাগানো। পরিবর্তনশীল বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তু এবং ঘটনাকে গতির মধ্যে দেখা এবং পারিপার্শ্বিকতার সাথে তার ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্যে তার বিকাশ কিংবা রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে বোঝা। অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে নয়, বস্তুধর্ম এবং জীবন সংগ্রাম থেকে বস্তু এবং জীবনকে জানা। এভাবে বস্তুজগত ও সমাজজীবনের রূপান্তরের সংগ্রাম ও তার অভিজ্ঞতার সার সংকলনের মধ্য দিয়েই ইহজাগতিক এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত হতে পারে। অন্যথায় আমরা চিন্তার বিভ্রাট কিংবা কল্পনা-বিলাসের মধ্যে তলিয়ে যাবো।

সেক্যুলারিজম সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, "যে ল্যাটিন শব্দটি থেকে এর উৎপত্তি, তার অর্থ মূলে ছিল প্রজন্ম বা যুগ। তার থেকে খৃষ্টীয় ধর্মবিষয়ক রচনায় শব্দটি ব্যবহৃত হয় ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু অর্থাৎ ইহলোক ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপার বোঝাতে। যে বাড়িঘর উপাসনার জন্য নির্মিত নয়, তা সেক্যুলার; যে শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মের পাঠ দেয় না, তা সেক্যুলার; যে-ভাবধারা পার্থিব বিষয়ে সীমাবদ্ধ তা সেক্যুলার। অতএব সেক্যুলারিজম বলতে বুঝায় ইহজাগতিকতা।" তিনি এ ধারণা বিকাশের পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতার যে ভাবাদর্শ, তার বিকাশের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্রাচীন গ্রীসে এর সাক্ষাৎ পাই যেমন-এপিকিউরিয়ান দর্শনে, ভারতবর্ষে এর পরিচয় পাই-যেমন চার্বাক মত বা লোকায়ত দর্শনে। আরব ভূখন্ডে এর অস্তিত্ব দেখি-ইবনে রুশদ বা মুতাজিলাদের মুক্তচিন্তায়। কিন্তু এসব ভাবধারা সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয় নি, পরিবেশের ওপর জয়ী হয় নি। সেই জয় ঘটে ইউরোপে রেনেসাঁসের সময়ে, মানবতাবাদের বিকাশের কালে। ... .. সমাজশক্তির যে রূপান্তরের ফলে মানবতাবাদের বিকাশ ঘটে, তা একদিকে সামন্তবাদ ও যাজকগোষ্ঠীর শাসন থেকে ব্যক্তির মুক্তি ঘটাতে সাহায্য করে, অন্যদিকে ধর্ম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাদেশিকতার জাগরণ ও রাজার ঐশ্বরিক অধিকারের ধারণার বিরুদ্ধে জনমত গঠনকে সম্ভবপর করে তোলে। স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পর ক্রমে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ ঘটল এবং এই মত স্বীকৃত হলো যে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব তার সকল নাগরিকদের ইহলৌকিক কল্যাণ-সাধনের নিরলস প্রচেষ্টা করা।"[২০]

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "শিক্ষার কাজ হবে আমাদেরকে সত্যের যত কাছাকাছি সম্ভব নিয়ে যাওয়া। এ উদ্দেশ্যে সত্যবাদিতা শেখাতে হবে। পূর্বতন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নতুন প্রমাণ মেনে নেয়ার জন্যে আমাদেরকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।"[২১]

সামন্ত-স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধরে নেয়া হয়েছিল যে একমাত্র ঈশ্বরই সর্বজ্ঞ। মানুষ ততখানিই জানতে পারবে যতখানি ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনুগ্রহ তৈরি হয়। আর রাজা-বাদশারা যেহেতু ঈশ্বরের প্রতিনিধি তাদের মাধ্যমেই শুধু ঈশ্বরের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাবে। তাই সেটা শিরোধার্য। ফলে দাঁড়ালো, শাসকদের দ্বারা শিখিয়ে দেওয়া বিষয়ই হবে শিক্ষা এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু। প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা, অনুসন্ধান করা অর্থাৎ চিন্তার দরজা খুলে রাখা হবে পাপ কাজ। ভূমিদাস-কারিগরদের পেট রক্ষা এবং সামন্ত প্রভুদের ভোগবিলাসের আয়োজন পূর্ণ করা পর্যন্ত উৎপাদিকা শক্তিকে একদিকে আটকে রাখা হয়েছিলো, অন্যদিকে রাজতন্ত্র এবং যাজকতন্ত্রের শেখানো বুলির মধ্যেই মানুষের ভাবজগৎ সীমাবদ্ধ ছিলো।

চিন্তার এই বদ্ধতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণী চিন্তার স্বাধীনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চার ধ্বনি তুললো। ধর্মবিশ্বাস এবং বিজ্ঞানচিন্তার মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। যেমন ধর্মগ্রন্থে বলা আছে, স্রষ্টা ছয়দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবী সৃষ্টি

হয়েছিল, ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময় ধরলে, ৫৭৬৫ বছর আগে এবং প্রথম মানুষ তৈরি করা হয়েছিল দিন কয়েক পরেই। একথা মেনে নিয়ে কি জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা বা জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব? আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাথে তার কোন মিল বা সম্পর্ক আছে কি? বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ধরনের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ রকমই একটি বিষয়ে বলতে গিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেল উল্লেখ করেন, "বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বৈদ্যুতিক শলাকা আবিষ্কারের সময় আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের উভয় দেশের যাজকসম্প্রদায় তৃতীয় জর্জের সমর্থনে ঘোষণা করলো যে, এটি হলো ঈশ্বরের ইচ্ছাকে হার মানানোর অনৈতিক চেষ্টা। ওইসব সুচিন্তার লোক জানত যে অধার্মিকতা বা বড় কোন পাপের শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বর বজ্র পাঠায়। কোন ধার্মিক লোক কখনও বজ্রাহত হয় না। সুতরাং, ঈশ্বর যদি কাউকে বজ্রাহত করতে চান তাহলে তার ইচ্ছাকে হার মানানো বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পক্ষে উচিত হবে না। বরং এর অর্থ হল কোন অপরাধীকে শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়া। বোস্টনের পুণ্যাত্মা ডা. প্রাইসের মতে প্রজ্ঞাবান ফ্রাঙ্কলিনের আবিস্কৃত 'লৌহ শলাকা'য় বজ্র অকার্যকর হওয়ার জন্যই ম্যাসাচুসেট্স্ শহর প্রবল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছে। ... .. কিন্তু এই ঐশ্বরিক নিদর্শনের ফলে বোস্টনে শঠতার কমতি পড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বিদ্যুত-শলাকা ক্রমশ জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও ম্যাসাচুসেটসে ভূমিকম্পের প্রকোপ বিরল হয়ে রইল।"[২২]

বিজ্ঞানী কোপারনিকাস আবিষ্কার করলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। তখন ধর্মীয় ধারণা ছিল সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। কোপারনিকাস মরে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতকে প্রচার করার অপরাধে বিজ্ঞানী ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এবং উক্ত মতকে অংকের সাহায্যে প্রমাণ করার অপরাধে গ্যালিলিওকে বাকিজীবন কারাগারে থেকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। প্রায় চারশ' বছর পর এখন ভ্যাটিকানের পোপ সে-দিনের কৃত অপরাধের জন্য জগদ্বাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। এতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন হয় নি। শুধু কয়েক শ' বছর আগের ধর্মীয় মতের সত্য আজ এতই খেলো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তার পক্ষে দাঁড়ালে ধর্মকে আজকের যুগের অতিশয় নিরক্ষর কিংবা অসহায় জনগোষ্ঠীর কাছেও গ্রহণযোগ্য করিয়ে তাদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, "বিগত চারশ' বছর যাবত বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে দেখিয়েছে কিভাবে প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে এবং আধিপত্য অর্জন করতে হয়। এই সময় যাজক সম্প্রদায় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছে। সে লড়াই জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূ-তত্ত্ব, শারীরবিদ্যা ও শারীরতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব সব বিষয়ে। এক জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা আঘাত হেনেছে আরেক জায়গায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে অতিশয় পরাজয়ের পর উঠেপড়ে লেগেছে ভূ-তত্ত্ব প্রতিরোধে। জীববিজ্ঞানে লড়াই করেছে ডারউইনের বিরুদ্ধে এবং বর্তমানে যুদ্ধ করছে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের বিরুদ্ধে। প্রতি ধাপে তারা পূর্ববর্তী বিরুদ্ধাচরণের কথা জনগণের মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। যাতে তাদের বর্তমান বিরুদ্ধাচরণের উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে না পারে।"[২৩]

একথা ঠিক, একদিন বুর্জোয়াশ্রেণী যান্ত্রিক বস্তুবাদকে হাতিয়ার করে ধর্মীয় কূপমন্ডূক কিংবা তদানীন্তন ভাববাদী ধ্যান-ধারণাকে পরাস্ত করেছিলো। দার্শনিক হবস, লক, ফুয়ারবাখদের সে যান্ত্রিক বস্তুবাদ এখন অকার্যকর হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ;-যা আজকের যে কোন ভাববাদী-আধ্যাত্মবাদী ধারণাকে পরাস্ত করে জগত পাল্টাবার পথ দেখাতে সক্ষম তা বুর্জোয়াশ্রেণী গ্রহণ করবে না। কারণ তাহলে সমাজ বিকাশের নিয়মে সাড়া দিয়েই তাদের পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা পাল্টানোর সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হয়। অন্যদিকে ভাঙন তীরের অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে গিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবভীতিও কাজ করছে। ফলে আজকে বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের এককালের ঘোষিত সেক্যুলার নীতি থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে। এদের বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ যুগের একজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেন, "মানবতাবাদ-এর আগে গড়ে ওঠা প্রায় সমস্ত মতাদর্শগুলোই ঐশ্বরিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ... .. আর মানবতাবাদ, অর্থাৎ বুর্জোয়া মানবতাবাদ সেদিন যে মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছিল সেগুলি মূলতঃ গড়ে উঠেছিল মানুষকে কেন্দ্র করে। ... .. সেক্যুলার ধারণার শুরুই হচ্ছে অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে (all secular concepts start with the non-recognition of any supernatural entity)।"[২৪] তিনি আরও বলেন, "সুতরাং কারো ধর্মবিশ্বাসে যেমন উৎসাহ দেওয়াও নয়, আবার বাধা দেওয়াও নয় এটাই একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কোনমতেই এরকম হতে পারে না যে, সরকার সকল ধর্মকে সমানভাবে সমর্থন করবে। ... .. আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে এক উদ্ভট ধারণা গড়ে ওঠেছে যার অর্থ হচ্ছে সকল ধর্মকে সমান উৎসাহ দান। এরূপ পরিস্থিতিতে ধর্মান্ধতা বাড়িয়ে তোলা ছাড়া আমরা আর কি আশা করতে পারি। তাছাড়া এ মতের প্রবক্তারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যদি সকল ধর্মে সমান উৎসাহ দান বোঝায় তাহলে বাস্তবিক পক্ষে

পাকিস্ড়ান ও ভারতের মধ্যে পার্থক্য এই জায়গায় এসে দাড়াঁয় যে, প্রথমোক্তটি যদি ইসলামিক ধর্মীয় রাষ্ট্র হয়, তাহলে দ্বিতীয়টি একটি বহু ধর্মীয় রাষ্ট্র।"[২৫]

শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "... .. ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও সুশৃঙ্খল যুক্তিধারা গড়ে তোলার পরিবর্তে আধ্যাত্মবাদ ও কারিগরি বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটানোর প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের শিক্ষাজীবনে এই ঝোঁকটি বাস্তবিক পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ এ হচ্ছে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য।"[২৬]

শিক্ষা যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ, যুক্তিনির্ভর এবং ইহজাগতিক না হয় তাহলে চিন্তার ঐক্য, বিবেকের ঐক্য ও সৃজনশীল কর্মের ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিতে যে ঐক্য গড়ে ওঠে তা বড় জোর একটা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গন্ডী তৈরি করতে পারে, কিন্তু প্রগতির অর্থে তা কখনও সামাজিক কার্যকারিতা-সম্পন্ন হতে পারে না। কারণ নিয়মের বাইরে জগত চলে না, আর নিয়ম বহির্ভূত পথে জগতের পরিবর্তন বা রূপান্তরও সম্ভব নয়। নিয়মনির্ভর জ্ঞানের ঐক্য মানুষকে মানুষের সাথে মিলবার স্বস্তি ও শক্তি দেয়, সহনশীল ও দক্ষ করে, সমাজের বিকাশ তথা বস্তুগত ও ভাবগত উৎপাদন ত্বরান্বিত করে। অন্যদিকে ভাববাদী-আধ্যাত্মবাদী কূপমন্ডূক ধারণা অজ্ঞানতার আক্রোশ, উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব, হতাশা এবং অবসাদগ্রস্ততায় মানুষকে নিক্ষেপ করে। সামাজিক মননে কুসংস্কারের এমন এক ধোঁয়াটে আবহাওয়া সৃষ্টি হয় যার মধ্যে অন্ধকারের শক্তি তাদের স্বরূপ লুকিয়ে রেখে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পায়। জাতীয় জীবনে ভাবসম্পদের দৈন্যদশা সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষার সিলেবাস কারিকুলাম সেক্যুলার নীতির ভিত্তিতেই প্রণয়ন করতে হবে।

একমুখী শিক্ষা ছাড়া প্রগতির পথে এগুনো যাবে না

একমুখী শিক্ষা মানে সকলকে একই শিক্ষা দিয়ে দেয়া বুঝায় না। বস্তুজগত নিয়মশাসিত। নিয়মের বাইরে গিয়ে ভিতরের কিংবা বাইরের-কোন প্রকৃতির উপরই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কিংবা তার শক্তিকে মানবহিতে কাজে লাগানো যায় না। সমাজ-সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তৃতিও সম্ভব নয়। তাছাড়া সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে তার ভবিষ্যৎ চলার গতিমুখ যদি সঠিক না হয় এবং বিজ্ঞানের নিরিখে সঠিক পথে দেশ-কালের সমস্ত জনগোষ্ঠীকে যদি পরিচালিত করা না যায় তাহলে সমাজ-সভ্যতা বিকাশের নিয়ম ও চাহিদার সাথে মানবের চলার ছন্দ ও গতির একটা অসামঞ্জস্য তৈরি হয়। ফলে অনেক শক্তি ও সম্ভাবনার অপচয় ঘটে। খণ্ডিত সমাজমনন ভাবের পূর্ণতা যেমন আনতে পারে না, তেমনি চতুর্মুখী টানাপোড়েনে বস্তুগত উৎপাদন বিকাশের গতি-শক্তিও মন্থর হয়ে পড়ে। তাতে মানুষের বস্তুগত ও ভাবগত সন্তুষ্টি বিধানের উপায় এবং অবলম্বন সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে। দিনে দিনে সংকট বাড়তে থাকে। এ পরিস্থিতি মানবের বৃহত্তর মিলন সত্তাকে খন্ডিত করে; অবক্ষয়কে প্রসারিত ও গভীর করে, শোষিত মেহনতী মানুষের সংগ্রামী শক্তিকে হীনবল ও বিপথগামী করে। জনকল্যাণমুখী মানব প্রচেষ্টায় আস্থা-ভরসা নষ্ট হয়।

আমরা একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করে যুক্তির এবং বিজ্ঞানের পথে এগুবো নাকি আধ্যাত্মবাদ-ভাববাদের পথে যাবো? আমরা কি মধ্যযুগীয় শিক্ষা প্রণালীতে আটকে থাকবো, নাকি আধুনিক-অগ্রসর শিক্ষাপদ্ধতি বেছে নেবো? নাকি পাঁচমিশালী জগাখিচুড়িতে শিক্ষার নামে কুশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদিকে লালন করবো? অতীত কাল থেকে এদেশের ছাত্র-জনতা বারবার দাবি তুলেছে, রক্ত ঝরিয়েছে বৈষম্যহীন, একমুখী, অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার জন্য। সংবিধানেও সে আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। আমাদের দেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদ-এ উল্লেখ রয়েছে, "রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য ... .. কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।" অথচ তিন/চার ধারার শিক্ষাকে বহাল রেখে ও উৎসাহ যুগিয়ে ৩৩ বছর ধরে সংবিধান লঙ্ঘন করে চলেছে আমাদের দেশের শাসকশ্রেণী। ১৯৯০ সালে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের দশ দফায় বর্ণিত হয়েছিল, "শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন, গ্রাম-শহরসহ সকল বৈষম্য (ক্যাডেটকলেজ, কিন্ডারগার্টেন, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, প্রি-ক্যাডেট, টিউটোরিয়াল হোম, মাদ্রাসা ইত্যাদি) দূর করে সারা দেশে অভিন্ন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা (One Channel of Education) চালু করতে হবে।" সেদিন দশ দফায় স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম দুই বড় দলই ক্ষমতায় গিয়েছে, কিন্তু ছাত্রসমাজের কাছে করা অঙ্গীকার তারা বেমালুম ভুলে থেকেছে এবং পায়ে মাড়িয়ে গেছে।

বর্তমানে আমাদের শিক্ষার মূলধারাই হলো নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার ধারা। কারণ শতকরা ৬০ ভাগ লোকই রয়েছে নিরক্ষর। বাকি যারা লেখাপড়া শিখতে চায় তাদের মধ্যে উচ্চবিত্ত স্বচ্ছল পরিবারের জন্য কিন্ডারগার্টেন, ক্যাডেট কলেজ, ও-লেভেল/এ-লেভেল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি একটা ধারা। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের একাংশের জন্য রয়েছে সাধারণ শিক্ষা; যার মধ্যে আবার শতকরা ৯৫ ভাগের জন্য বেসরকারি ও ৫ ভাগের জন্য সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র মানুষদের জন্য ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার নামে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু আছে। আবার গরিব নিম্ন আয়ের এ মানুষদের একটা ক্ষুদ্র অংশ যারা এককালীন কিছু টাকা খরচ করতে পারে তাদের সন্তানদের জন্য ভোকেশনাল (বৃত্তিমূলক) ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

এভাবে পরস্পরবিরোধী, বৈষম্যমূলক বিভিন্ন স্রোতধারায় পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা একটা সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ভাবমানস, জাতিসত্তা, শ্রেণীবোধকেই শুধু খন্ডিত এবং বিভক্ত করে না, জনগণের বিভিন্ন অংশকে সংঘাতময় উদ্দেশ্যহীন বৈপরীত্যের মধ্যেও ঠেলে দেয়। পাশাপাশি বিজ্ঞানমনস্ক সংহত জাতীয় বিকাশের ধারাকেও স্থবির করে দেয়। বিজ্ঞানের উপর যাদের সামান্য ধারণা আছে, তারা জানেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটা বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে সত্য একটাই অবস্থান করে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে বহু সত্যের (Plurality of truth) ধারণা বিজ্ঞানবিরোধী। ফলে জীবন এবং জগৎকে বুঝবার এবং পাল্টাবার জন্য বুনিয়াদিজ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হলে একমুখী শিক্ষার (One Channel of Education) বিকল্প নেই। আজ থেকে ৫০ বছর আগে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন, "সাবেক প্রথার বাংলাদেশে এখনও তিনটি শিক্ষা প্রণালী আছে এবং তাহা সরকারের অনুমোদিত নিউ স্কীম মাদ্রাসা, ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষা। ইহা শিক্ষা ক্ষেত্রে শুধু গন্ডগোলই সৃষ্টি করিয়াছে এবং মুসলমান সমাজে অনৈক্য আনয়ন করিয়াছে। ... আযাদ পাকিস্তানে ইহাদের অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন, বরং হাস্যকর এবং লজ্জাকরও বটে। পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে সরকার একাধিক শিক্ষাপ্রণালী কখনও মঞ্জুর করেন না।"[২৭] ফলে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক একমুখী শিক্ষার পথে আমাদের সমাজ-সভ্যতা বিকাশের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে শিক্ষানীতি ঠিক করতে হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষা অবহেলিত হচ্ছে

বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত নিয়ম ও কার্য-কারণ সম্পর্কের বিশেষ জ্ঞানকেই সাধারণত প্রকৃতি বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা হয়। আর জগৎ এবং জীবনকে জানবার, ধারাবাহিক পদ্ধতিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ শিক্ষার মধ্য দিয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার ধারা ও প্রয়োগ পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারাই আসলে বিজ্ঞান শিক্ষা। বস্তুজগত নিয়ত পরিবর্তনশীল। ফলে বিজ্ঞান হচ্ছে জগত পরিচিতির ক্রমবিকাশমান জ্ঞানকোষ। যে বস্তুগত উৎপাদন বিকাশের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতা এগিয়েছে তার মধ্য থেকেই বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছে। এবং এ বিজ্ঞানের শক্তিই মানব সভ্যতাকে সামনের দিকে নিয়ে চলেছে। শুধু বস্তুগত উৎপাদন নয়, বিজ্ঞানের বিকাশ ভাবগত উৎপাদন তথা শিল্প-সংস্কৃতিসহ মানব চিন্তার সামগ্রিক কাঠামোকেও ক্রমাগত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে চলেছে।

আদিকালে মানুষের অভিজ্ঞতা-অনুমান-অনুসন্ধানের আলোকে জগত ও জীবনকে জানা-বুঝার চেষ্টা থেকে মানব মনে অসীম কৌতূহল, রহস্য উদ্‌ঘাটনের আকুতি ও চিন্তার বিপুল ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। তা থেকেই ক্রমে ক্রমে পদ্ধতিগত, পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের রূপে বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। আর সভ্যতার সেই ঊষালগ্নে বিজ্ঞানের আদিরূপ প্রকাশ পেয়েছিল জাদুকর, পাঁচক, কর্মকারদের নানা ধরনের কলা কৌশলমূলক কাজের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেছে, বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে কোন মতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য করতে পারে তা হলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল, জগতে যা-কিছু ঘটছে এ-সমস্তই একটা অদ্ভুত জাদুশক্তির জোরে; অতএব তারও যদি জাদুশক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে অনুরূপ শক্তির যোগে সে কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে। সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা শুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সে চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে; মান্‌ব না, মানাব। ... বিশ্বব্রহ্মান্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস।"[২৮]

প্রকৃতি বিজ্ঞানের দু'টি দিক। একটি তত্ত্বগত এবং অন্যটি প্রায়োগিক কিংবা প্রযুক্তিগত। পর্যবেক্ষণ, সনাক্তকরণ, নানাবিধ অবস্থার বিবরণসহ প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় ও রূপান্তরের দিকনির্দেশনাকে সূত্রায়িত করে বিজ্ঞানের তত্ত্বগত কাঠামো গড়ে ওঠে। আর এর ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক উৎকর্ষ ও নিপুণতার মধ্য দিয়ে প্রযুক্তিগত দিকের বিকাশ ঘটে। প্রযুক্তিগত বিকাশ মৌল বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণাকে সহায়তা করে। আবার মৌল বিজ্ঞানের বিকাশ ছাড়া প্রযুক্তিও একটা স্তরে এসে স্থবির হয়ে পড়ে।

সংগঠিত মানুষের পশু শিকার, পশুপালন, কৃষিকাজ, মৃৎশিল্প, বস্ত্রনির্মাণ, ধাতুকর্ম, নৌ-চালন ও অন্যান্য যানবাহন, স্থাপত্য, যন্ত্রনির্মাণ ইত্যাদি কর্মকান্ড পথ রচনা করেছিল প্রযুক্তি-গণিত-জ্যোতির্বিজ্ঞান-পদার্থবিজ্ঞান-রসায়নশাস্ত্র-জীববিজ্ঞান-সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক সূত্র আবিষ্কারের। তত্ত্বীয় বিজ্ঞান বা মৌল বিজ্ঞান গবেষণার কাজটি শুরুতে এক বা একাধিক বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হতো। তাঁরা নিজেদের বাড়িকেই অনেকটা ল্যাবরেটরী বানিয়েছিলেন। মাদাম কুরী-পিয়েরে কুরী, এডিসন অনেকেই এভাবে বিজ্ঞান গবেষণাকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছেন।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সামন্তীয় কূপমন্ডূক স্থবির ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতার যে জাগরণ সৃষ্টি হয় তা থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। সেজন্যই আমরা দেখতে পাই শিল্প-বিপ্লবের যুগে ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। সামন্ত স্বৈরতান্ত্রিক কূপমন্ডূক ভাবধারার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া উদারনৈতিক মুক্তবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রথমে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে, পরে ইউরোপে শত শত বিজ্ঞান সমিতি গড়ে ওঠে। এ সমিতিগুলোর মাধ্যমেই বিজ্ঞান চর্চা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ভাবনা, তর্ক-আলোচনা ও বিজ্ঞান মেলায় নানা ধরনের প্রদর্শনীর বিষয় হয়ে ওঠে। শুধু খাদ্যের অন্বেষণ নয়, বাঁচতে হলে জ্ঞানের অন্বেষণ করেই বাঁচতে হবে। জ্ঞানের বসন-ভূষণে, জ্ঞানের ছায়াতলে ঠাঁই নিতে হবে; সর্বমুখে জ্ঞানের আলো জ্বেলে জগতকে আলোকিত করতে হবে; সকল অন্ধত্ব, কুসংস্কার ও আধ্যাত্মবাদী কূপমন্ডূক ধারণার গন্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে-এ জাতের ভাবনার বিকাশ ঘটেছিল অবিশ্বাস্যরূপে।

পুঁজিবাদের উত্থানের যুগে বুর্জোয়াশ্রেণী উৎপাদন ও মুনাফার অবাধ প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে মৌল বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার উপর জোর দিয়েছিল। এবং তারই সাহায্যে শিল্প বিপ্লব, কৃষি বিপ্লব সংগঠিত করেছিল। পরবর্তীকালে সে ইউরোপেই বিজ্ঞানের চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেল। আজ তাদের একচেটিয়া যুগে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অবক্ষয়ের কালে তারা মৌল বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। এখন তারা প্রযুক্তিকে অবলম্বন করে সর্বোচ্চ মুনাফা লুটার পথ ধরেছে। মুক্তবুদ্ধির মানব কল্যাণমুখী বিজ্ঞান চর্চা বন্দী হয়ে পড়েছে ধনকুবের গোষ্ঠীর মুনাফা-চক্রে। মানব কল্যাণের পরিবর্তে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ ঘটেছে মানব বিধ্বংসী কাজে। পদার্থ বিজ্ঞানী জে ডি বার্নাল বলেন, "বিজ্ঞানের সত্যিকারের অধঃপতন তখনই ঘটে যখন সমাজের ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়ানোর স্বার্থে বা ধ্বংস সাধনের উপায় রূপে বিজ্ঞানের কদর বাড়ে। তখন বিজ্ঞানের হতাশ্বাস এবং বিকৃত রূপটি পরিস্ফূট হয়। অনেক বিজ্ঞানীর অবশ্য ধারণা ঐ সব উদ্দেশ্য না থাকলে সমাজ (শাসকগোষ্ঠী ও পুঁজিপতিশ্রেণী - সম্পাদনা পরিষদ) বিজ্ঞানের পেছনে আদৌ পয়সা ঢালতো না।"[২৯] যার নমুনা হিসাবে আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বের প্রথম শিল্প-শক্তি আমেরিকা আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ৬০ ভাগ অর্থই ব্যয় করে সামরিক মারণাস্ত্র তৈরির উন্নত কলাকৌশলের সন্ধানে। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র এক সময় বলেছিলেন, "পশ্চিমের পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময়, এতখানি এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয় নি। ... .. এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে, বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম, শহরকে শহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বার করেছে এবং আরো কতো বার করতো এই যুদ্ধটা আরো কিছুদিন অগ্রসর হলে। ... .. এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। ... কথা উঠতে পারে, মানবের কল্যাণকর এমন কি কিছুই এই থেকে আবিষ্কৃত হয় নি? হয়েছে বৈ কি। কিন্তু সে নিতান্তই by-product-এর মত বলা যেতে পারে।"[৩০] অধ্যাপক আলী আনোয়ার বলেন, "... সাম্রাজ্যবাদ তার উপনিবেশে যে বিজ্ঞানকে নিয়ে আসে তা বিজ্ঞান ততটা নয়, যতটা টেকনলজি, যে টেকনলজি আবার বিজিত দেশে যন্ত্রশিল্পের সূচনা করে শোষণেরই দক্ষ যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। ফলত বিজ্ঞান যে মুক্তবুদ্ধির পরিপোষণা করে-সেই ভাবাদর্শ ততটা প্রচারিত ও আচরিত হয় না, যতটা মুনাফার লক্ষ্যে নিয়োজিত প্রযুক্তি বিকাশ লাভ করতে থাকে। ফলে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকাই যে ভিন্ন হল তাই নয়, ভাবাদর্শগত বিনির্মাণের ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা হল ভিন্ন। তা সমাজের বৃহত্তর অংশের চিন্তাকে স্পর্শ তো করলই না বরং সমাজের চিন্তা এবং বিজ্ঞানের

মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বৈরিতা সৃষ্টি হল। সমাজের গভীরে বিজ্ঞানের শিকড় জল পেল না। তাই বলে যে বিজ্ঞানের প্রতি কোনোই আকর্ষণ ছিল না তা নয়। ফলত বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা মিশ্র দ্বৈধতার বোধ (ambivalence) সমাজে জারিত হয়ে গেল। একদিকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানকে অপরিহার্য ভাবা, অন্যদিকে মানস জগতের জন্য বিপজ্জনক ও বিভ্রান্তকারী মনে করা-এই মনোভাবের বৈশিষ্ট্য।"

আমাদের দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, "অন্যান্য অনেক তৃতীয় বিশ্বের দেশের মত আমাদেরও 'গেরেম ভারী' পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগের জন্য অনেক সদিচ্ছা প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানে অশিক্ষিত রাজনীতিবিদরা না হোন, পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তারা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও প্রকৌশলের ব্যাপক প্রয়োগ ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। উন্নয়নের যে-স্বপ্ন আমাদের তাড়িত করে তা হল বিরাট বিরাট হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক প্রজেক্ট গর্জনমুখর, হাই-টেনশন বৈদ্যুতিক তারের তন্তুজালে সমগ্র দেশের আকাশ জটিল রেখাঙ্কিত, বড় বড় কল-কারখানা দিনরাত ধোঁয়া ওগরাচ্ছে, ঘরে ঘরে গ্যাসের জ্বালানী, চাষের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, কর্মস্থলে কম্পিউটার, যোগাযোগের জন্য মাইক্রোওয়েভ টেলিফোন, বিনোদনের জন্য স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইত্যাদি-ইত্যাদি। কিন্তু তারপরই অবাক লাগে এই ভেবে যে, এর সবকিছুই ত এসেছে আমাদের দেশে-কিন্তু উন্নয়ন কই? বিজ্ঞান কই? এসবই এসেছে বিদেশ থেকে পণ্য হিসেবে, উচ্চমূল্যে কেনা। ক্রেতা হয়তো সরকার, হয়তো ব্যক্তি। বিজ্ঞান রূপান্তরিত হয়েছে কনস্যুমার গুডসে। ... .. এমন কোন ছোট শহর নেই আমাদের দেশে যেখানে গাড়ি সারাবার মেকানিক, ফ্রিজ সারাবার মিস্ত্রী বা টেলিভিশন সারাবার টেকনিসিয়ান পাওয়া যাবে না। এদেরকে কেউই অবশ্য বৈজ্ঞানিক বলবে না। তার প্রধান কারণ এদের অধিকাংশেরই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। যে-যন্ত্রে তাদের দক্ষতা, তার পেছনে কাজ করে যে-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তা তাদের জানা নেই। কিন্তু জানা থাকলেই কি এঁদের বৈজ্ঞানিক বলা যেত? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রতিবছর যে হাজার হাজার স্নাতক বেরোচ্ছে তারাই কি বৈজ্ঞানিক? অস্বস্তিকর হলেও স্বীকার করতেই হয় যে, এরাও বিজ্ঞানী নয়। তবে কি এদের যাঁরা শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে, অথবা বি.সি.এস.আই.আর, এ্যাটমিক এনার্জি সেন্টার, বিরি (BRRI) ও অনুরূপ সমস্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যাঁরা চাকরি করছেন তাঁদের কি অন্তত বিজ্ঞানী বলে স্বীকার করে নেওয়া উচিত নয়? হয়তো উচিত। কিন্তু যদি একটু ভাবতে বসি, গত চল্লিশ/পঞ্চাশ বছরের আবিষ্কার বা তত্ত্বের জগতে কি অবদান এঁরা রেখেছেন, যাকে বলা যাবে অভিনব, যার জন্য বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজ এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ-তাহলে বিব্রত বোধ করতেই হবে। নতুন জ্ঞান বা তত্ত্ব এখানে তৈরি হচ্ছে না।"[৩১]

কেন এ অবস্থা তৈরি হলো তা বুঝবার জন্য বর্তমান বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার করুণ দশার চিত্রটি একনজরে দেখা যাক। দেশের ৮৭.৫% স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী পাঠ উপকরণ নেই। ৮১.৩% স্কুলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নেই। আর গবেষণাগার নেই ৯৪% স্কুলে। ১৯৯০ সালে এইচএসসি-তে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থী ছিলো মাত্র ২৪.৬৯%। ১৯৯৫ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬.৬৯%। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তো ২৫% শিক্ষার্থী, এখন তা ৫%-এর নিচে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রচার (১৯৮৯ সালের হিসেব) মাত্র ১.৬৫%, যেখানে বিদেশী ছায়াছবি ও ভিডিও টেপ প্রদর্শনীর হার ২১%।[৩২] ২০০৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিল মাত্র ৩২.৭৪%, ডিগ্রি পরীক্ষায় ১০.১২%, ২০০৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ২৪.৪৩%। উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি ও অনার্স-মাস্টার্সে বিজ্ঞান পড়ানো হয় এমন কলেজগুলোতে বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকের ঘাটতি প্রায় ৫০%।[৩৩]

এই যখন বিজ্ঞান শিক্ষার অবস্থা, তখন দেশে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে ওঠবে কি ভাবে? যুক্তিবাদী সমাজমনন গড়ে ওঠবে কি ভাবে? অন্যদিকে মানুষের মধ্যে, সমাজমননে বিজ্ঞানমনস্ক মনোভাব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোন কর্মসূচি শাসক দলসমূহের কার্যকলাপের মধ্যে নেই। শুধু তাই নয়, গোটা শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার সার্বিক আয়োজন-অনুষ্ঠানাদির মধ্যেও তাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে চরমভাবে। বেদনাদায়ক হলেও সত্য, এর ফলে এদেশে যুক্তিবাদী-বিজ্ঞানমনস্ক সমাজমনন তো গড়ে ওঠেই নি বরং কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতা সমাজমানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিজ্ঞান চর্চার পরিবেশ বিস্তৃত করা না গেলে সমাজ মননের বন্ধ্যাত্ব সমাজ প্রগতিকে ব্যাহত করবে, পঙ্গু ও জীর্ণ করে তুলবে। আর এরই মাঝে আধ্যাত্মবাদী কাল্পনিক ভাবপ্রবণতা সমাজ এবং মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারের দিকে ধাবিত করবে। আমাদের অবস্থা তাই হয়েছে।

কিছু দিন পূর্বে মিটফোর্ড, ঢাকা এবং পিজি হাসপাতালে ১০৩ জন মানসিক রোগীর মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে-এদের দু'তিন জন ব্যতিত অন্য সকলেই তাদের মানসিক অসুস্থতাকে 'জ্বীনের আছর' বলে ভেবেছিল। এই 'জ্বীনের আছর'-এর চিকিৎসার জন্য এদের সকলেই পীর-ফকির, ঝাড়-ফুঁক, পানি-পড়া ইত্যাদির আশ্রয় নিয়েছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে এদের শতকরা ৮২.৫ জনই শিক্ষিত এবং ৬৭ জনই শহরে বাস করেন, মাত্র ৬ জন হলো কৃষক। বৃষ্টির জন্য শাসক দলের পক্ষ থেকে ইশতেসকার নামাজ ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। ঝড়-জলোচ্ছাস এর আগাম সংকেত পেয়েও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা দায়সারা গোছের করেই সারা দেশের মানুষকে দোয়া-খায়েরের মাধ্যমে ঐশী সাহায্যের জন্য রেডিও, টিভিতে প্রচারসহ নানা দিক থেকে কুসংস্কারকেই লালন করা হচ্ছে এবং বিজ্ঞানমনস্কতা উন্মেষের সম্ভাবনাকে বারে বারে বিনষ্ট করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীব ধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে ...।"[৩৪]

ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রচার মাধ্যম এবং বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান একাডেমি, বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মননে আধুনিক মানুষ তৈরি করার বিষয়ে শিক্ষানীতিতে গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা। যদি তা না হয়, তাহলে শুধু পদার্থ বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি পাঠেই প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল। যেমন একজন সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্ম কোন ঐতিহাসিক সময়ে কি ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে এবং তদানীন্তন পরিস্থিতিতে তার সাহিত্যকর্ম সমাজ-সভ্যতা, সংস্কৃতি চেতনা ও সংগ্রাম বিকাশের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছে তা নিরূপণ করার মধ্য দিয়ে সাহিত্য বিচারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং তার পঠন-পাঠনে এই বিষয়টি খেয়ালে রাখা প্রয়োজন।

খন্ডিত, একদেশদর্শী কিংবা খুপড়িবদ্ধ (compartmental) শিক্ষা সুনাগরিক তৈরি করে না

আজকের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়া শিক্ষাকে খন্ডিত করেছে। শিক্ষাকে খুপড়িবদ্ধ (Compartmental) করে মানুষকে সুদক্ষ কলুর বলদে পরিণত করে ব্যক্তি-মুনাফার হাতিয়ারে পরিণত করেছে। শিক্ষা সৃজনশীল জ্ঞান ও উচ্চতর সামাজিক কর্তব্যবোধ না হয়ে অহংকারের বোঝা, মিথ্যা-মর্যাদাবোধ আর ভোগ-সুখের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতাকে কালিমালিপ্ত করছে। সংস্কৃতিকে বিকৃত চেহারায় দাঁড় করিয়ে বিকারগ্রস্ত মন নিয়ে সুখের সন্ধান করছে। অথচ পুঁজিবাদের উন্মেষকালে নবজাগরণের আলোকে-স্নাত মানবতাবাদের যৌবনদীপ্ত সময়ে যে-মানুষগুলি আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞানের মশাল জ্বেলেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সেদিনের ক্রান্তিকালের প্রথম সারির সৈনিক। কারণ বিপ্লব তো কেবল অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে বা রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্তি নয়; তা জ্ঞান-বিজ্ঞান, মনুষ্যত্ব-স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা, কাব্য-সঙ্গীত-সাহিত্য প্রভৃতি সকল মানবিক সুকুমার বৃত্তি ও মননশীলতার মুক্তির জন্য লড়াই।

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওর্থ সে সময়টাকে চিহ্নিত করে 'The Prelude' কবিতায় উল্লেখ করেছিলেন,

"But Europe at that time was thrilled with joy,
France standing on the top of golden hours,
And human nature seeming born again.
... But to be young was very Heaven."[৩৫]

(সে মহালগণে উচ্ছলতায় মন্থিত ইউরোপ,/ সোনালী দিনের তোরণ চূড়ায় ফ্রান্স,/ নবজন্মের বেদনা-আকুল মানবপ্রকৃতি যেন।/ ... সে নব ঊষায় সে ছিল সকল সুখের সার/ আর সে ঊষার তারুণ্য সুখ স্বর্গ সুখেরই নাম।)

সভ্যতার এই মুক্তিলগ্নকে মহান দার্শনিক এঙ্গেলস এভাবে চিহ্নিত করেছেন, "এটা ছিল মানবজাতির তখন পর্যন্ত দেখা মহত্তম প্রগতিশীল বিপ্লব। সে সময় অভাবনীয় প্রতিভা জন্মের একটা আকুতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং বাস্তবে চিন্তা-অনুভূতি-চরিত্রে সর্বজনীনতা এবং জ্ঞানে অভাবনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন বহু

মানুষের জন্মও হয়েছিল। যেসব মানুষ আধুনিক বুর্জোয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতা ছাড়া আর কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। তখন বিখ্যাত লোকদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া খুবই বিরল যার ব্যাপকভাবে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল না; যিনি চারটা বা পাঁচটা ভাষা জানতেন না, যিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন নি। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি কেবল মাত্র একজন মহান চিত্রকরই ছিলেন না, তিনি একই সাথে একজন গণিতবিদ, যন্ত্রবিদ এবং প্রকৌশলীও ছিলেন যার কাছে পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় শাখাগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য ঋণী। ... ... লুথার কেবলমাত্র চার্চের নোংরা আস্তাবলই পরিষ্কার করেন নি, জার্মান ভাষাকেও সংস্কার করেছেন; আধুনিক জার্মান গদ্য তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই বিজয়ের আস্থাসমৃদ্ধ সেই সঙ্গীতটির কথা এবং সুর রচনা করেছিলেন যা সপ্তদশ শতাব্দীর মার্সেইলেজ (ফরাসী বিপ্লবের গান)-এর মর্যাদা পেয়েছিল। ঐ সময়ের বীরেরা তখনও পর্যন্ত তাঁদের উত্তরসূরিদের মত শ্রমবিভাজনের অনিবার্য ফসল নানা সীমাবদ্ধতা এবং একদেশদর্শিতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন নি।"[৩৬]

কিন্তু কি সে কারণ যা পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ বা বুদ্ধিজীবীদের থেকে তাদের ভিন্ন-লোকের বাসিন্দা করেছিল? এর কারণ, সেদিনকার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব-যার একটা বৈপ্লবিক চরিত্র ছিল-সেটা আজ আর বিপ্লব নেই, প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়েছে। একদিন নবজাগরণের যৌবনকালে বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারায় বুর্জোয়ারা ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার মুক্তির লড়াইয়ের জন্য যুক্তি ও পার্থিব মানবতাবাদকে হাতিয়ার করেছিল। যা-কিছু পুরাতন-শাশ্বত তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল এবং প্রয়োজনে জ্ঞান চর্চার আহ্বান করেছিল। আজকে তারাই পুঁজিবাদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থায় তাদের শ্রেণীশাসনকে অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে শোষণমূলক ব্যবস্থাকে শাশ্বত করতে চাইছে। তারা একদিকে জ্ঞানচর্চায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রয়োজনে নিছক কারিগরি বিদ্যার চর্চা এবং অপরদিকে চিন্তাচেতনায় ফেলে আসা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই মনে রাখতে হবে, খুপড়িবদ্ধ একদেশদর্শী শিক্ষা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মীয় কুসংস্কার বা রহস্যবাদকে চর্চা করা একই মুদ্রার দু'টি পিঠ।

শিক্ষা জ্ঞানচক্ষু খুলে দেয়। এর দৃষ্টি একদেশদর্শী হতে পারে না। জ্ঞানতত্ত্বের সকল শাখায় সমন্বিত জ্ঞানের আধারে শিক্ষার সাধারণ মান-এর শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে একজন শিক্ষার্থী বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবে। বিশেষ জ্ঞানের গভীর থেকে গভীরে পৌঁছাতে থাকবে। সে গবেষণা করতে শিখবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা কৌশল রপ্ত করবে, নব নব আবিষ্কার তথা সৃজনশীল কর্মদক্ষতার উচুঁ ধাপে উঠবে। সে একটা গন্ডীর মধ্যে ঘুরপাক খাবে না। যে বস্তুর অণু-পরমাণুতে ইলেক্ট্রনের গতি খুঁজবে, সে মানুষের মনের মতি-গতি, দুঃখের কারণ, সুখের উপায় বুঝবে না-এটা একদেশদর্শিতা।

অবশ্য একজন মানুষকে সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে এমন কথা নেই; এবং এটা বাস্তবও নয়। কিন্তু এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে একজন পদার্থ বিজ্ঞানী অর্থশাস্ত্রের পুঁজি-পণ্য, দাম-মূল্য-মুনাফা, শ্রমের মূল্যতত্ত্ব, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব ইত্যাদি বিষযে সাধারণ ধারণা রাখেন না। ভাষা সাহিত্যে পন্ডিত ব্যক্তি অর্থশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় কিছুই জানেন না। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞরাই, যে-সমাজে বাস করেন সে-সমাজকে ভালো চেনেন না। এ-সমাজের বিকাশের ইতিহাস কি, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব কি, সমাজের বৈপ্লবিক বাস্তবতা এবং তার প্রগতিশীল রূপান্তরের ইতিহাস নির্ধারিত পরিণতি কি এবং সে-বিবেচনায় সচেতন মানুষ হিসেবে তার নিজস্ব সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য কি-এ সকল বিষয়ে বোঝেন না বা বোঝার চেষ্টাও করেন না। ফলে ভাসা ভাসা পরিমাপ-পর্যালোচনার দ্বারা নিজস্ব গন্ডীর বাইরে তারা এমন মন্তব্য করেন যা শুধু হালকা কিংবা স্থূলই হয় না, অনেক সময় তার দ্বারা মানুষ বিভ্রান্ত হয়। তাদের জ্ঞানের গঠন কাঠামো অনেকটা এমন যেন চোখ আছে, হাত নেই; হাত আছে তো পা নেই-এই দশা। এতে বাস্তবে তাদের মধ্যে এক ধরনের সমাজ বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় এবং ব্যক্তিরাও যন্ত্র হয়ে ওঠেন। এই খন্ডিত জ্ঞান মানুষকে অসম্পূর্ণ করে রাখে। আর তখন তাদের বিশেষ দক্ষতা এবং খন্ডিত মেধা-মনন একচেটিয়া ধনকুবের গোষ্ঠীর কাছে লোভনীয় পণ্য হয়ে ওঠে। তারা নিজেরা নিজেদের সঁপে দেন অন্ধ কর্মনেশায় আর ভোগ-লালসায়। আজকের দিনে ব্যুরোক্রেট, টেকনোক্রেট, বিশেষ শাখায় পারদর্শী কারিগর, গবেষক, পরিচালক ইত্যাদি পেশার মানুষের আত্মবিক্রিত দশার এটাও অন্যতম কারণ।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সেজন্যই বলেছিলেন, "একজন মানুষকে কোন বিদ্যায় বিশেষত্বের শিক্ষা দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। এর ফলে সে একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রে পরিণত হতে পারে, কিন্তু কখনোই পরিপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না। মূল্যবোধ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা এবং জীবনানুগ উপলব্ধি অর্জন করা ছাত্রদের পক্ষে অপরিহার্য। যা কিছু সুন্দর এবং নৈতিক দিক থেকে শুভ সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট উপলব্ধি তাকে অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে তার বিশেষত্বের জ্ঞান নিয়ে সে একটি সুশিক্ষিত কুকুরের মতোই বেড়ে উঠবে, সর্বাঙ্গ বিকশিত মানুষ হিসেবে নয়। আশু

সুবিধা লাভের যুক্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি এবং অসময়োচিত বিশেষীকরণের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ আমাদের সেই চেতনাকে ধ্বংস করে দেয়, যার উপর বিশেষীকৃত জ্ঞানসহ আমাদের গোটা সাংস্কৃতিক জীবনটাই নির্ভরশীল।"[৩৭] বিখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষাবিদ আনাতোলি লুনাচারস্কি বলেন, "কারও নির্বোধ হওয়া উচিত নয়। যাবতীয় বিজ্ঞান ও কলার মূল বিষয়গুলি সকলেরই জানা উচিত। মুচি কিংবা রসায়নের অধ্যপক-আপনি যাই হোন-কলাবিদ্যার একটিও বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে অবশ্যই আপনি হবেন এক চক্ষুহীন বা কালা'র (বধির) মতো এক মারাত্মক পঙ্গু মানুষ।"[৩৮] জে. ব্রনোওস্কি বলেন, "কখনো কখনো এমন একটা তথ্য প্রচার করা হয়ে থাকে যে ইতিহাসের যে-সময়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় নি ঠিক তখনই শিল্পকলা বিকশিত হতে পেরেছে। এ ধরনের তথ্য শুনে মাঝে-মাঝে মনে হয় বিজ্ঞান যেন সংস্কৃতিকে ধ্বংসই করে থাকে। এই বক্তব্য এতই ইতিহাসবিরোধী যে সে-সম্বন্ধে কোনো তর্ক করার ইচ্ছা আমার নেই। কোন যন্ত্রের রুক্ষ কুৎসিত ছাপ পড়ে নি, শিল্পকলার এমন একটা স্বর্ণযুগ কখন কোথায় ছিল? প্রাচ্যে? মিশরে, ভারতবর্ষের, আরব ভূখন্ডের ইতিহাসে তেমন যুগ দেখা যায় না। তাহলে কি প্রতীচ্যে? বলা হয়, গ্রীস দেশে প্রতীচ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল; দেখা যায় গ্রীস সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সময়টিতে শিল্প আর বিজ্ঞান এমনভাবে একে অপরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ছিল যে আধুনিক কালেও তেমনটি নয়। ... .. সাহিত্যের স্বর্ণযুগ ছিল প্রকৃতপক্ষে তখনই যখন শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম আর বিজ্ঞান 'হাত ধরাধরি' করে চলেছে। ... .. বিজ্ঞান দু'ভাবে আমাদের মূল্যবোধকে বদলে দেয়। আমাদের পরিচিত সংস্কৃতির মধ্যে তা নতুন ধারণা ঢুকিয়ে দেয়। ... .. তার ফলে আমাদের অজান্তেই আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি পুনর্নির্মিত হয়ে যায়। কবিতার বিষয়বস্তুর উপর যান্ত্রিক মুদ্রণশিল্পের কোনো প্রভাব থাকতে পারে না বলেই মনে হয়, কিন্তু একটা ছাপানো কবিতা যখন বারবার পড়া সম্ভব হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই কবিতার ছন্দের গুরুত্ব কমে গিয়ে তার অর্থ আর ইঙ্গিত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। তেমনি যন্ত্র দিয়ে ছবি তোলা সম্ভব হয়ে ওঠায় চিত্রশিল্পী কিংবা চিত্রামোদীর আগ্রহ, হুবহু নকল করার সম্ভাবনা থেকে অন্য বৈচিত্র্যের দিকে চলে যায়। এ ধরনের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ফলে আমাদের অনুভূতিগুলোও নূতনভাবে তৈরি হয়ে গেছে। ... .. আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ধারণাগুলো যে আমরা বুঝতে পারি না, তাও ঐ ভাষার অভাবেই। পুনর্নির্মাণের কালে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ভাষা ছিল একই। কিন্তু এখন আর তা নেই। এখন তাই আমাদের দায়িত্ব হলো সেই সর্বজনীন ভাষা তৈরি করা, যে ভাষা বিজ্ঞান আর শিল্পকলাকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবে। তা হলে সর্বজনীন বোধের জগতে সাধারণ মানুষ আর বিজ্ঞানীও এক হবে।"[৩৯]

ফলে জ্ঞান জগতের সকল সীমানার প্রান্ত ছুঁয়ে সামাজিক চাহিদা পূরণের বৈপ্লবিক বাস্তবতাকে নজরে রেখে সাধারণ জ্ঞানের পাটাতনের উপর বিশেষ শাখায় পারদর্শিতা লাভের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ যাতে ঘটে সেদিকে খেয়াল রেখে শিক্ষা কার্যক্রমকে ঢেলে সাজাতে হবে।

উৎপাদনমুখী-বৃত্তিমুখী-কর্মমুখী শিক্ষার নামে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে

শিক্ষা জীবনের প্রতিটি পর্বে কর্মের অনুশীলন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে প্রত্যেক মানুষকেই তার সর্বোচ্চ মেধা-মনন ও সৃষ্টিশীল ক্ষমতা জীবনভর সমাজে প্রয়োগ করে যেতে হয়। এটাই শিক্ষিত মানুষের সহজাত চেতনাগত বৈশিষ্ট্য। আমরা যে ধরনের শিক্ষার কথা ভাবছি তাতে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সময়কালে একজন শিক্ষার্থী ব্যবহারিক কাজের মধ্য দিয়ে নানা বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করবে। কিন্তু তারপরও কৃষি খামার, কারখানা, ল্যাবরেটরী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামরিক-বেসামরিক প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কাজে নিয়োজিত হবার পর তাদের বিশেষ দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিত্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শিক্ষার মূলধারার বাইরে এ ধরনের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু এটা সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না। বয়স্ক শিক্ষা, আইন-কানুনসহ নাগরিক কর্তব্য, শাসন-প্রশাসন, মনোবিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়েও দক্ষ ও সচেতন করার জন্য প্রচার মাধ্যমসহ নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন থাকা দরকার। এ-ধরনের ভোকেশনাল শিক্ষা কর্মক্ষেত্রের সকল শাখাতে থাকা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু বর্তমানে উৎপাদনমুখী শিক্ষা, বৃত্তিমুখী শিক্ষা ইত্যাদি বলে শাসকশ্রেণী সাধারণ ও উচ্চশিক্ষার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অস্বীকার করতে চাইছে। পুঁজিবাদী শোষণের সমাজব্যবস্থায় সীমিত কর্মক্ষেত্রের দায় পুঁজিবাদের বদলে শিক্ষার উপর চাপাতে চায়। শিক্ষিত মানুষের, বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে বলেই বেকারত্ব বাড়ছে, ফলে উচ্চশিক্ষাকে সংকোচিত করা দরকার বলে এরা প্রচার করছেন। সামাজিক চাহিদার কথা বলে 'জুতার মাপে পা'-এ

নীতি কার্যকর করতে চায়। নইলে এ ধরনের ভাবনা আসবে কেন? যে-ছেলে স্কুলে-কলেজে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, সে নিজের এবং পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় ছোটখাট কারিগরী কাজ, চাষ-বাস, প্রাথমিক চিকিৎসা, আসবাবপত্র মেরামতসহ ইত্যাদি কাজ জানবে না কেন? আবার ছোট হোক, বড় হোক কারিগরী কাজ-মেরামতির কাজ করতে উচ্চশিক্ষিত প্রকৌশলীদেরই বা অসুবিধা কোথায়?

কেউ কেউ আবার কারিগরী শিক্ষার মধ্যেও সমমর্যাদাভিত্তিক শ্রমবিভাজনের পরিবর্তে শ্রেণীভেদ দাঁড় করানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যেমন উচ্চশিক্ষিত প্রকৌশলী, আধা শিক্ষিত টেকনিশিয়ান ও অশিক্ষিত দক্ষ মিস্ত্রী; এদের অনুপাত ১ ঃ ৫ ঃ ২৫ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। এ সবই ঔপনিবেশিক আমলের আভিজাত্য ও আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার সাথে অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের বর্তমান সময়ের শ্রমবিমুখ মানসিকতার এক অদ্ভুত সমন্বয়। উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারদেরও সবার সমান দক্ষতা হবে না। ফলে একজন ইঞ্জিনিয়ার যদি রকেট নির্মাণের কাজ করে, অন্যজন ভারী শিল্পের নক্সা তৈরি করে, তার পাশাপাশি আর একজন প্রকৌশলী যদি দালানের ইট গাঁথে কিংবা ঘরে বিদ্যুৎ তারের সংযোগ দেয়ার কাজ করে তাতে ক্ষতি কি? একজন ইঞ্জিনিয়ার গাড়িতে করে অফিসে এসে সারাদিন পেট্রোল বিল, ঠিকাদারী বিল ইত্যাদিতে সই করার চাইতে এ-কাজটা অনেক বেশি ফলপ্রসু এবং সম্মানের। কিন্তু আমরা এভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নই।

আমাদের দেশের আমলাদের পিয়ন, চাপরাসি, ব্যাটম্যান ইত্যাদি নাহলে চলে না। অথচ উন্নত ধনতান্ত্রিক বহু দেশে এসবের অস্তিত্ব নেই। আমরা শিক্ষায় পিছিয়ে আছি, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অসংগতির মধ্যে গোঁজামিল দিয়ে বেঁচে আছি। সেজন্য নিজেরা যেমন দাসসুলভ পরনির্ভর মানসিকতা ছাড়তে পারি না, তেমনি চাকর-বাকর-চৌকিদার ছাড়াও চলতে পারি না। মিথ্যা মর্যাদার বদলে সত্যিকারের মর্যাদা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করার স্বার্থেই এই মানসিকতার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আনতে হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ-ফেরৎ ভারতীয় সৈনিকদের জন্য সম্ভবত প্রথম বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইংরেজের রাজত্ব রক্ষার জন্য এক সময় নেটিভ ভারতীয়দের হাতে গাদা বন্দুক দিয়ে তাদেরকে যুদ্ধের খোরাক বানানো হয়েছিল। আবার যুদ্ধের প্রয়োজন শেষে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থেকে ইংরেজ রাজত্বের ক্ষয়ক্ষতি পোষানো ও মেরামত সারিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের হাতে হাতুড়ি-শাবল ধরিয়ে দিতে চেয়েছে। যুদ্ধ-ফেরৎ নজরুল কলম ধরেছিলেন। আবার হাতুড়ি-শাবলও তিনি বাদ দেন নি। তবে হাতুড়ি-শাবল চালিয়ে পরাধীন দরিদ্র মানুষের জীবনের পরিণতি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং দ্রোহের মধ্য দিয়েই যে তা প্রতিকারের রাস্তা বের করতে হবে সে-কথা নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে। তাই তিনি 'কুলিমজুর' কবিতায় লিখেছিলেন,

"বেতন দিয়াছ?-চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল!
... আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
... .. তুমি শুয়ে র'বে তেতালার 'পরে, আমরা রহিব নিচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে-ভরসা আজ মিছে!"[৪০]

এ চেতনাকেই ইংরেজরা ভয় করতো। পাকিস্তানীরা ভয় করেছে এবং বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের ধনিকশ্রেণীও ভয়ের চোখে দেখে। তাই তারা চিন্তাশীল মননের বিকাশ বর্জিত যন্ত্রমানবের হাতে হাতিয়ার যন্ত্র জুড়ে দিয়ে তাদের মুনাফা নিষ্কন্টক ও শাসন নিশ্চিত করতে চাইছে।

আদি কাল থেকে কাজ এবং কাজের ফলাফল থেকে মানুষের আদি শিক্ষা গড়ে উঠেছে। মানুষ বস্তুর উপর হাত চালিয়েছে, মাথা খাটিয়েছে; নতুন নতুন বস্তু তৈরি করেছে, পরিমাণে এবং গুণে রূপান্তরিত বস্তু মানুষের ভোগ-ব্যবহারের কাজে লাগিয়েছে। এটা করতে গিয়ে বহু বিচিত্র ধারায় মানুষের ভাবনার শক্তি ও পরিধি বেড়েছে। এ অগ্রসর ভাবনা আবার বস্তুর উপর ক্রিয়া করার ক্ষমতা ও কলাকৌশলকে উন্নত করেছে। উন্নত উৎপাদিকা শক্তি মানুষের

ভাবনা বিকাশের নতুন শর্ত সৃষ্টি করেছে। যদিও উৎপাদন সম্পর্কের সাথে উৎপাদিকা শক্তির চূড়ান্ত অসঙ্গতি দূর করার সংগ্রাম ছাড়া মানুষ তার ভাবনাকেও আটকে পড়া দশা থেকে মুক্ত করে এগিয়ে নিতে পারে নি। সেজন্য শিক্ষা মানেই কর্মমুখী তথা প্রয়োগধর্মী।

প্রকৃত শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি সে-শিক্ষা যা মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও চাহিদাকে সামাজিক প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত করে। অন্যায়-অসঙ্গতির অনুভবকে শাণিত করে এবং ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হতে শক্তি যোগায়। জীবন এবং শ্রম (কায়িক-মানসিক)-কে অভিন্ন করে, পরগাছা সুলভ জীবনের প্রতি লজ্জা আনে এবং শ্রমের মর্যাদা ও সামাজিক চেতনাসম্পন্ন সত্যিকার মর্যাদাবোধের ধারণার জন্ম দেয়। কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি মানবিক উৎকর্ষ সৃষ্টি করে। ব্যক্তির প্রবৃত্তি চাহিদাকেও সামাজিক প্রয়োজনের কাছে নত করে। বিকশিত জীবনের দিকে পরিচালিত করে। এক কথায় জীবনকে উন্নত করে, সমাজকে বিকশিত করে, উঁচু সাংস্কৃতিক সুরে জীবনকে বাঁধতে এবং মনুষ্যত্বকে আরও উঁচুতে তুলতে সংগ্রাম সাধনার পথ দেখায়।

সেজন্যই শিক্ষা বা জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষের যা কিছু অর্জন তা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। বড় বিজ্ঞানীর একটা আবিষ্কার মানুষের বৈষয়িক চাহিদা পূরণের দ্বার অভাবনীয়রূপে উন্মোচিত ও অবারিত করে দিতে পারে, সহস্র মানুষের শত বছরের উৎপাদন ক্ষমতাকে কয়েক ঘন্টায় অতিক্রম করার ক্ষমতা নির্মাণ করে দিতে পারে। তেমনি বড় সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম, বড় শিল্প, উচ্চতর মানবিক জীবনবোধ ও রসবোধ সৃষ্টি করে মানব মনের মতি-গতিকে ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগের প্রচন্ড আবেগে সমাজমুখী করে তুলতে পারে। 'মানুষের জন্য মানুষ' এই বোধ-অসাম্য, আদিমতা, বর্বরতার অনেক উপাদানকে মানব মন থেকে নির্মূল করে শোষণ মুক্তির আবেগে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রেরণা জাগাতে পারে। নজরুল বলেছেন, বড় বড় কবির কাব্য পড়া এইজন্য দরকার যে তাতে কল্পনার জট খুলে যায়, বদ্ধ ধারা মুক্তি পায়। মনের মাঝে প্রকাশ করতে না পারার যে উদ্বেগ তা সহজ হয়ে ওঠে।

কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখী শিক্ষার নামে শাসকশ্রেণী জনগণকে জগত ও জীবনের মৌলিক নিয়ম-নীতি জ্ঞানে অজ্ঞ, সমাজ সম্পর্কে অসচেতন, শাসকশ্রেণীর অন্যায় শাসন ও তার কার্যকারণ বুঝতে অপারগ করে রাখতে চায়। শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে শ্রেণী স্বার্থ, শ্রেণী ঐক্য ও সংগ্রাম থেকে তারা থাকবে বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন। অথচ কর্মে হবে দক্ষ অর্থাৎ হাতের কাজ কিংবা যন্ত্র চালনার কাজে থাকবে পটু এবং কুশলী। মস্তিষ্ক হারাবে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ক্ষমতা, মন থেকে লুপ্ত হবে মানবিক অনুভূতি, থাকবে শুধু অধিক টাকা রোজগারের ভাবনা, শিখিয়ে দেয়া কৌশল রপ্ত করার একাগ্রতা, উদ্দেশ্যহীন কর্মনেশা।

বলা হয়ে থাকে যে কর্মমুখী বা কারিগরি শিক্ষার প্রসার না ঘটায় বেকারত্ব বাড়ছে। উৎপাদনমুখী শিক্ষা সম্পর্কে অধ্যক্ষ মকবুল আহমেদ বলেন, " 'উৎপাদনমুখী শিক্ষা' কথাটি বাংলাদেশে অনেক দিন থেকে শোনা যাচ্ছে। ... .. ব্যক্তিগত মুনাফামুখী ও হালে বিদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প কারখানায় কাজ পাওয়ার জন্য যে ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তারই নামকরণ করা হয়েছে 'উৎপাদনমুখী শিক্ষা'। পুঁজিপতির ব্যক্তিগত মুনাফার প্রয়োজনে আধুনিক কলকারখানার কাজ করার উপযোগী করে তুলতে একজন শ্রমিককে যে প্রশিক্ষণ পুঁজিপতির নিজের টাকায় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্পন্ন করতে হতো তা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রীয় তদারকির মাধ্যমে করে নেয়। এই প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে বুর্জোয়াশ্রেণী জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে। বৃত্তির জন্য এই শিক্ষাকে বলা হচ্ছে যুগের উপযোগী আসল শিক্ষা। ... দেশব্যাপী বেকারত্বের কারণ যে স্বয়ং পুঁজিতান্ত্রিক পশ্চাৎপদ সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত এ সত্য কথাটি তারা সুচতুরভাবে আড়াল করে এবং দোষটা দেয় ... সাধারণ শিক্ষার উপর। ... .. আসলে কোনো ধরনের উচ্চশিক্ষা নিজে থেকে বেকার সৃষ্টি করে না, বরং পুঁজিবাদী শোষণ-শাসন বেকার সৃষ্টির জন্যে দায়ী। তার পরেও শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী সাধারণ শিক্ষার ওপর দোষটা দিয়ে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে জনগণের সচেতনতার অভাবে। ... .. নিজের অশিক্ষার অজ্ঞানতা থেকে ওঠে আসার ব্যাকুলতা সব মানুষের মধ্যে থাকে। কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের কাছে তাদের অজ্ঞানতা জয় করার চেয়ে ক্ষুধা জয় করা অতি জরুরি হয়ে পড়ে। তাই পুঁজির পীড়নে অসহায় মানুষ দারিদ্র্য ও বেকার জীবনের ভয়াবহতা লক্ষ করে 'কর্মসংস্থানের জন্য টেকনিক্যাল শিক্ষা' শাসকশ্রেণীর ছুঁড়ে দেয়া শ্লোগানটি গ্রহণ করে নেয়। ... ... নিরক্ষর তমসাচ্ছন্ন জনগণকে শিক্ষার আলো দেয়ার জন্য রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে বা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করছে ভাবলে বড়ো ধরনের ভুল করা হবে। এ কালের রাষ্ট্রেরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কিছুটা লেখাপড়া জানা কর্মীর ও দক্ষ শ্রমিক বাহিনীর। তবে শিক্ষাটা এমন পর্যায়ে রাখা চাই, যা প্রশিক্ষণ গোছের, যা শুধু কাজ চালাবার মতো এবং যা দিয়ে শুধু মেশিন চালানোই সম্ভবপর। জ্ঞান জিনিসটা যেন সেখানে মোটেই না পৌঁছায়।"[৪১]

ফলে হাতের কাজ শেখালে, সবাইকে কারিগর-মিস্ত্রী বানিয়ে দিলেই দেশের উন্নতি ঘটবে-এ ধারণা ভুল। একটা বিশাল জাহাজ নির্মাণ করে যদি তাকে হাল ছাড়া চলতে দেওয়া হয় তাহলে দিকনির্দেশনাহীন গতিময়তার যে দশা হবে, তেমনি বৃত্তিমুখী শিক্ষার নামে ইতিহাস-সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদি শিক্ষাকে অবহেলা করলে আমাদেরও একই পরিণতি হবে। কারণ সমাজ-সভ্যতা বিকাশের ধারায় মৌল জ্ঞান বিকাশের শর্ত হিসাবেই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন সময় আবির্ভূত হয়েছে। আজ তাকে অস্বীকার করা নয় বরং আরও সমৃদ্ধ-বিকশিত করে তুলতে হবে এবং সমন্বিত করতে হবে। আগামী দিনের সমাজ-সভ্যতা বিকাশের উপযোগী করতে হবে। দর্শন একদিন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র যুগিয়েছে, আবার বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা দর্শনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে সম্ভাবনাময় দিগন্ত উন্মোচন করে মানুষকে নানা বিষয়বস্তু দেখতে শিখিয়েছে।

তাই আজ সমন্বিত শিক্ষা চাই। অর্থাৎ সকলের জন্য সাধারণ শিক্ষাকে এমন স্তরে উন্নীত করা চাই যাতে একজন মানুষ ইচ্ছা করলেই জ্ঞান জগতের যে কোন পথে প্রবেশ করতে পারে। জ্ঞান অন্বেষার ক্ষেত্রে চিন্তার ক্ষমতাকে, ভাবনার গতিকে অবাধ ও স্বাধীন করে তুলতে পারে। এ ভাবেই মুক্তবুদ্ধির বাধাহীন চর্চা তথা বুদ্ধির রাজ্যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞান জগতে বিচরণের ক্ষেত্রে মানুষ আপেক্ষিক মুক্ত স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের দেশে সমন্বিত শিক্ষার এ স্তর হওয়া বাঞ্ছনীয় স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত। বাধ্যতামূলক শিক্ষাও সেজন্য স্নাতক পর্যন্ত করতে হবে। এটাই আজকের সময়ের দাবি। এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই শিক্ষানীতিতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও শিক্ষার সিলেবাস তৈরি করা প্রয়োজন।

মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা নয়

'মাদ্রাসা' বলতে সাধারণত ইসলাম ধর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বোঝায়। একটি দৈনিক পত্রিকায় 'মাদ্রাসা শিক্ষা' প্রবন্ধে কথাসাহিত্যিক বশীর আলহেলাল লিখেছেন, "আরবি দার্‌স্ শব্দটির অর্থ শিক্ষার পাঠ, বক্তৃতা। ... মাদ্রাসা শিক্ষালয়, পাঠশালা, স্কুল। ... দার্‌স্ ও তদ্‌ঘটিত শব্দগুলো যেহেতু আরবি, আরব অঞ্চলগুলো থেকে ইসলাম বিকশিত ও প্রচারিত হয়, আমাদের এসব বৃহত্তর অঞ্চলে মাদ্রাসা বলতে ক্রমে ক্রমে ইসলামি বিদ্যালয় হয়ে ওঠে।"

ইসলাম ধর্ম শিক্ষা কিংবা ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বিষয়, বিধি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের ১৪০০ বছর ধরে একই রকম ছিল না এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে তার যেমন ভিন্নতা আছে, আবার একই দেশের ভেতরেও নানা ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান। নবী ও খলিফাদের আমল থেকেই প্রথমে নতুন ধর্ম হিসাবে ইসলামের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা, ঐতিহ্যগত গোত্রীয় সংঘাতের বদলে নব সম্প্রদায়গত মেলবন্ধন ও সেই আলোকে মানবিকতা, অন্যান্য ধর্ম বিশেষ করে খ্রিষ্টান, ইহুদী, পৌত্তলিক, অগ্নি উপাসক ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাচরণের সাথে পার্থক্য এবং সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা তাবু, ঘর কিংবা পর্বতের গুহা-ছায়ার মধ্যে হতো। তারপর মসজিদকেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রধানত মৌখিকভাবে দেয়া হতো।

খলিফা ওসমানের সময়কালে মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ কোরান লিখিত রূপে প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে কোরান পাঠ, আয়াতসমূহ কণ্ঠস্থ করা, লিখন রীতি আয়ত্ত করা, উৎকর্ষ সাধন, ইসলাম ধর্মভিত্তিক জীবনাচরণ নীতি-আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি শিক্ষার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলো। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে সামন্তীয় ইসলামী শাসন-প্রশাসন ও তার প্রতি আনুগত্যের ধরন, হাদীস ও বহুবিধ নৈতিক উপদেশাবলী তার সাথে সম্পৃক্ত হয়। ইসলাম ধর্মে নবীর উপদেশবাণীর মধ্যেই রয়েছে বিদ্যা শিক্ষার জন্য সুদূর চীনদেশে যাওয়ার কথা। ফলে ইসলাম ধর্মের একটা কাল পর্যন্ত তার তাগিদ ছিলো। এই পর্যায়ে গ্রীস, রোম ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার দেশসমূহের দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির বিকাশ হয়েছিল। এ সমস্ত বিষয় আত্মীকরণের একটা প্রচেষ্টাও মুসলমানদের মধ্যে ছিলো। যার ফলে পুরানো সকল ধর্ম ও তৎকালীন সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা নতুন এই ধর্মের আবেদন উদার চেতনা নিয়ে তুলনামূলকভাবে অবরুদ্ধ ও পশ্চাৎপদ বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৫০০ বছর আরব ভূখন্ডে মুসলমানদের দ্বারা জ্ঞান চর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল।

এই প্রসঙ্গে ১৯২০ সালে গঠিত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা এম.এন.রায় লিখেছিলেন, "আরবদের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকেই আধুনিক যুক্তিবাদের জনকেরা আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রদূতেরা গ্রীসীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছে। রজার বেকন ছিলেন

আরবদের শিষ্য। হাম্বলের মতে, পদার্থবিজ্ঞান বলতে আজ আমরা যা বুঝি সেইসব জড়বিদ্যার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলো আরবেরা। প্রয়োগ পরীক্ষা এবং পরিমাপই ছিলো তাদের হাতিয়ার যার সাহায্যে তারা প্রগতির পথ কেটে বের করলো গ্রীসীয় ও আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার মাঝখানে সেতু নির্মাণ।

আলকান্দি, আলহাসান, আলফারাবী, আবিসেনা (ইবনে সিনা), আলগাজ্জালী, আবুবকর, এভেমপেস (ইবনে বাজ্জা), আলপিটরাজিয়াস (আলবিতরুজী) য়ুরোপীয় ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থে আরবী নামগুলো চিরস্মরণীয় আর আধুনিক সভ্যতার অগ্রদূতদের এ্যারিষ্টটলের প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত করে যিনি য়ুরোপীয় মানবতাকে অনুর্বর পান্ডিত্যাভিমান এবং ধর্মতন্ত্রের গোঁড়ামীর পক্ষাঘাতদুষ্ট প্রভাব থেকে মুক্তি সংগ্রামে অপরিমিত প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন, সেই সুধীশ্রেষ্ঠ এ্যাবেরোজ (ইবনে রুশদ)-এর কীর্তিও অমর হয়ে রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আন্দালুসীয় সুলতানের গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠপোষতায় আরবের যে প্রধান যুক্তিবাদী বেড়ে উঠেছিলেন তাঁর যুগান্তকারী ভূমিকা রজার বেকনের বহু পরিচিত এই উক্তিতে সরবে বিঘোষিত হচ্ছে 'প্রকৃতির দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ইবনে রুশদ'।

প্রাচীন গ্রীসের ঋষিকল্প পুরুষদের সাধনালব্ধ ফল আরবেরা শুধু উদ্ধারই করে নি, সংগ্রহ এবং রক্ষাও করেছে। বহুল সমালোচনার দ্বারা এগুলোর যথারীতি উন্নতি বিধানও তারা করেছে। প্লেটো, এ্যারিষ্টটল, ইউক্লিড, এ্যাপোলোনিয়াস, টলেমি, হিপোক্রেটস এবং গ্যালেনের সম্পূর্ণ গ্রন্থরাজী আধুনিক য়ুরোপের জনকেরা আরবী অনুবাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম পেয়েছে-শুধু অনুবাদ রূপেই নয়, পেয়েছে পান্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা সমৃদ্ধ অবস্থায়। ... .. একটি যাযাবর জাতি সরল ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে চিন্তার যে স্বাধীনতা পেয়েছিলো, তা ক্রমে এতই নির্ভীক হয়ে উঠেছিল যে আমিরুল মুমেনিনদের ঐহিক স্বার্থের সঙ্গে তার সংঘাত হলো অবশ্যম্ভাবী। পাঁচশত বছর ধরে ইসলামের চিন্তাধারার যে অভাবিতপূর্ব উন্নতি হয়েছিলো, তার প্রত্যক্ষ ফলাফলের মর্ম নিবদ্ধ করতে গিয়ে ইবনে রুশদ যখন তাঁর এই উগ্র বিপ্লবাত্মক মতবাদের কথা বললেন যে বিচারবুদ্ধিই সত্যের একমাত্র উৎস তখন মোল্লাদের চাপে পড়ে কর্ডোভার সুলতান আল-মনসুর ধর্মের কর্তৃত্বাভিমানে এই ধর্মবিরোধী মতামতের জন্য নরকাগ্নির ভয় দেখিয়ে বের করলেন রাজানুশাসন। ইসলাম যখন তার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে অস্বীকার করলো তখনই শুরু হলো তার অবনতি। মানব সভ্যতার শক্তিশালী উত্তোলন যন্ত্রের পরিবর্তে সে হয়ে দাঁড়ালো প্রতিক্রিয়া, অসহিষ্ণুতা, অজ্ঞতা আর অন্ধবিশ্বাসের অস্ত্র স্বরূপ। দুটো সাম্রাজ্যের ধ্বংসগ্রাস থেকে আর দুটো ধর্মের নিরন্ধ্র অন্ধকার থেকে প্রাচীন সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ উদ্ধার করে ইসলাম তার ঐতিহাসিক ভূমিকা যথাযথ অভিনয় শেষ করে দিলো; আর তারই আপন মৌলিকরূপের প্রতি কটাক্ষ হেনে অবশেষে তুর্কী বর্বরতা আর মালিকদের লুটতরাজের কৃষ্ণ পতাকা রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। ... সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে বিপ্লবী আরবেরা তার পতাকা রোপন করে নি, করেছে ইসলামে দীক্ষিত মধ্য এশিয়ার বর্বরেরা আর বিলাস-বিহ্বলতায় নীতিচ্যুত পারস্যবাসীরা। মোহাম্মদের স্মৃতিতে রচিত বিরাটতম কীর্তিস্তম্ভ আরব সাম্রাজ্যকে এরাই করেছে বিপর্যস্ত। তবু ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ বিপ্লব যখন পর্যুদস্ত হয়ে গেলো তাতেই হলো ভারতের সমাজে বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি তখন অগণিত জনসাধারণ তা থেকে স্বস্তি ও মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচার জন্য ইসলামের বার্তাকেই জানালো সাদর সম্ভাষণ।"[৪২]

এই পরিস্থিতিতেই ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। যদিও অষ্টম শতাব্দী থেকেই ভারত, ইরান, আফগান, আরব, মধ্য এশীয় অঞ্চল থেকে মুসলিম বণিক, ধর্ম প্রচারক, আক্রমণকারী সেনাপতি-শাসকদের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। এই শিক্ষা ছিল মূলতঃ ইসলাম ধর্মমূলক আচার-অনুষ্ঠান ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার মূলনীতির মধ্যে সীমিত। ধীরে ধীরে মক্তব ও মাদ্রাসা গড়ে উঠতে থাকে। এগুলি ছিল মূলতঃ মসজিদ কিংবা মসজিদসংলগ্ন। বাস্তবে স্থায়ী মুসলিম রাজত্বের সূচনা হয় ১১৭৪ সালে মুহাম্মদ ঘোরীর রাজত্বকাল থেকে এবং সর্বশেষ মুঘলদের মাধ্যমে এই রাজত্ব টিকে ছিলো ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত। এ সময়কালে পার্শী ও আরবী ভাষার মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা দেয়া হতো। ধর্ম শিক্ষার সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাত্রায় গণিত, ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, দর্শন, আইন-কানুন, বিচার ও ন্যায়শাস্ত্র, সম্পদ-মালিকানা ও বন্টন ইত্যাদি বিষয় যুক্ত হয়। মোহাম্মদ ঘোরী, বখতিয়ার খিলজি, নাসিরুদ্দিন, গিয়াসউদ্দিন বলবন, জালালুদ্দিন, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, ফিরোজ শাহ তুঘলক প্রমুখ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তব-মাদ্রাসা গড়ে ওঠে ও সমৃদ্ধ হয়। সিকান্দার লোদির সময়কালে মক্তব এবং মাদ্রাসায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি দেখা যায়। কারণ তখন রাজভাষা ছিল পার্শী আর হিন্দুরা মূলতঃ রাজ কর্মচারী হওয়ার জন্য পার্শী শিখতে এই মক্তবগুলোতে আসতো। ১৫২৬ সাল থেকে মোঘল সম্রাট বাবরের রাজত্বকাল শুরু হয়। বাবর, হুমায়ূন, শেরশাহ, আকবর, জাহাঙ্গীর, আওরঙ্গজেব, বাহাদুর শাহ, হুসেন শাহ প্রমুখ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মক্তব-মাদ্রাসা যেমন সম্প্রসারিত হয় তেমনি মক্তবগুলোতে ইসলামী ধর্মশিক্ষা ও ধর্মাচরণ শিক্ষার চেয়েও ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয় এবং অন্যান্য ধর্মমত ও

সংস্কৃতির বিষয়ও কোথাও কোথাও গুরুত্ব পেতে থাকে। রাজা হুসেন শাহ'র পৃষ্ঠপোষকতায় নদীয়ায় বৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্যে তার ছাপ পাওয়া যায়। আকবরের শাসনামলে তিনি হিন্দু-মুসলিম মিলনের সেতুবন্ধন হিসেবে 'দীন-এ-এলাহী' নামক নতুন যে ধর্ম প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন তার পরিপূরক হিন্দু-মুসলিম-সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিছক ধর্মশিক্ষার মক্তব বা মাদ্রাসা থেকে মুক্ত করে সর্বজনীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন রাজ্য বিস্তার ও রাজক্ষমতাকে সংহত করার প্রয়োজন থেকেই। তিনি শিক্ষার সূচিকে "এক. এলাহীবিজ্ঞান-যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত দৈববিদ্যা ও নীতিশাস্ত্র, দুই. রিয়াজীবিজ্ঞান-যার মধ্যে থাকবে অংক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত গতিবিদ্যা ও তিন. তবই-ই বিজ্ঞান-যার মধ্যে থাকবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এই তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন।"[৪৩]

উইলিয়াম অ্যাডাম তার ১৯৩৫-৩৮ সালের রিপোর্টে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার একটি বিবরণ দিয়েছিলেন, "সে সময় মধ্যযুগের ইউরোপের মতো মাদ্রাসা শিক্ষায় কিছু উন্নত ধরনের অধ্যয়নের প্রমাণ পাওয়া যায়। আরবী বিদ্যালয়ে পাঠক্রম ছিল বহু বিস্তৃত। সেখানে ব্যাকরণের কাজ হত নানা রকমের এবং সে কাজ খুবই সুবিন্যস্ত ছিল। তাছাড়া শিখতে হত ছন্দ, তর্কবিদ্যা, আইন শাস্ত্র, ইসলামের সূত্রগুলি, টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক দর্শন, অধিবিদ্যা প্রভৃতি। এই শিক্ষার মান খুবই উঁচু ছিলো। সঙ্গীত বিদ্যার কোন চর্চা ছিল না। গতিবিদ্যা শেখানো হতো ছন্দের মাধ্যমে। সবকিছুই ছিল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে। চিকিৎসাবিদ্যা শেখানো হতো না। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার বাইরে হাকিমী বিদ্যার চলন ছিল। ইউরোপে যেমন অ-খ্রিষ্টীয় রোমান আইনের দ্বারা শিক্ষার কর্মসূচী নিয়ন্ত্রিত হত, ভারতে মুসলিম শিক্ষায় তার পরিবর্তে ছিল কোরান-আদর্শের শিক্ষা। ভারতের এই শিক্ষার ইতিহাস বলা যায় খুব বেশী রকমের যান্ত্রিক ও পুঁথিকেন্দ্রিক ছিল, ধর্মীয় অধিবিদ্যার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করাই ছিল মূল মাপকাঠি। তবে ভারতে ইতিহাস চর্চার রেওয়াজ মুসলমান আমলের একটি উল্লেখযোগ্য বিরাট অবদান। এই যুগে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের শিক্ষার ধারায় স্মৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষাই ছিলো মুখ্য। নিজ নিজ ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা নেওয়ার সামাজিক রেওয়াজ ছিলো এই যুগের বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়, কালক্রমে মুসলিম শিক্ষার প্রতি হিন্দুদেরও আগ্রহ জাগে প্রধানতঃ চাকরী-বাকরীর সুবিধার্থে। জাতপাতের সামাজিক মর্মমূলে মুসলিম শিক্ষার ধারা একটা ধাক্কা দিয়েছিল। আবার সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আদর্শে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনেক ঐতিহ্য মুসলমানরাও আরবী ফার্সী অনুবাদের মাধ্যমে রপ্ত করেছিলেন।"[৪৪]

ধর্ম নয়, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিই ছিল ইংরেজদের মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

বৃটিশ-পূর্ব সময় পর্যন্ত এইভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু ছিল। তবে আধুনিক অর্থে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় নি। মসজিদ ও মাদ্রাসার পাশাপাশি সুফী মতবাদীরা বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য 'খানকা' গড়ে তোলেন। সুহরাবরদী, চিশতি, কলন্দরী, মাদারী, আহমদী, নকশবন্দী ও কাদিরী সম্প্রদায়ের সুফীরা এভাবে ধর্মীয় শিক্ষণ প্রসারিত করেন। সুফীবাদীরা একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাসের বাইরে স্থানীয় জনগণের আচার-সংস্কৃতি কোন কিছুর উপরই হস্তক্ষেপ করতেন না। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও ইহজাগতিক শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রাধান্য যেভাবে মক্তব মদ্রাসাগুলোতে এবং কোথাও কোথাও মাদ্রাসা বহির্ভূত সেক্যুলার স্কুল-শিক্ষা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হলেও বিকশিত হয়ে উঠেছিল, ইংরেজ শাসনে শুরু থেকে তাকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করে দেয়া হলো। হিন্দু-মুসলিম বিভাজন রেখা অংকিত হলো তীব্রভাবে এবং মাদ্রাসাকে একটা স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হলো। পাশাপাশি হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষাকে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক রূপে দাঁড় করানোর জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ইংরেজ ভারতবর্ষে এসে প্রথমেই ভারতবাসীকে ইংরেজী শিক্ষা দিতে চেয়েছিলো এ ধারণা ভুল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, ''সাধারণভাবে এমন কি শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেও একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, বৃটিশ সরকার এক কেরানীকূল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল। এর থেকে ভ্রান্ত ধারণা আর হয় না। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন এদেশে হয়েছিল বৃটিশ সরকার কর্তৃক নয়, তাদের ব্যতিরেকেই। নিঃসন্দেহে প্রথমে বৃটিশ সরকার এর বিরুদ্ধে ছিল, পরে তারা একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয়। ... .. জনসেবায় উদ্বুদ্ধ বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালীর উৎসাহ-উদ্যোগে এবং মিশনারী ও কিছু ইংরাজের সহায়তায় বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল।"[৪৫]

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য ওয়ারেন হেস্টিংস-এর মনোভাব থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, "কোলকাতার মুসলমানদের তুষ্ট করতে মুসলমান ভদ্রলোকদের সন্তানদেরকে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ও লোভনীয় পদগুলোর উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে, এবং আদালতের কর্মকর্তাদের যেসব পদ খালি হবে সেগুলোতে মাদ্রাসার সার্টিফিকেটধারী যোগ্য লোকদের নিয়োগ দিতে হবে।"[৪৬]

ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা এবং জোনাথান ডানকান ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি শিক্ষা হিন্দুদের মধ্যে দেয়ার চেষ্টাও ইংরেজরা করেছিল। কিন্তু ইংরেজদের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এবং আধুনিক শিক্ষার পক্ষে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ একটা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তার নজির আমরা লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের চিঠিতে পাই, "আমরা লক্ষ করছি সরকার হিন্দু পন্ডিতদের অধীনে একটি সংস্কৃত স্কুল খুলেছেন যেখানে ছাত্রদেরকে এমন সব জ্ঞান দেওয়া হবে যা ভারতে আগে থেকেই আছে। এই বিদ্যালয়টির কাছে কেবল একটি মজার বিষয়ই প্রত্যাশা করা যেতে পারে, তা'হল যুবকদের মস্তিষ্কগুলোকে ব্যাকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের দুর্বোধ্য মাহাত্ম্য দিয়ে বোঝাই করে দেয়া, যেগুলো ঐ যুবকেরা বা সমাজ কারোরই কোন কাজে লাগবে না। আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে মানুষ যা জেনেছে এবং যেগুলো ইতিমধ্যেই ভারতের সকল অংশে সাধারণভাবে শেখানো হচ্ছে ঐ ছাত্ররা সেগুলোই পড়বে। শুধু তার সাথে যুক্ত হবে অনুমাননির্ভর মানুষের সৃষ্টি ফাঁপা সূক্ষ্ম কিছু বিষয়। যদি এদেশটাকে অন্ধকারে রাখাই হয় বৃটিশ আইন সভার পলিসি, তাহলে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে বেছে নেয়া হয়েছে।"[৪৭]

পরবর্তী কালে সংস্কৃত কলেজের জন্য সাংখ্য, বেদান্ত ও ন্যায় দর্শন-এর সঙ্গে ইংরেজ ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের 'lnquiry' নামক পুস্তকও সংস্কৃত কলেজের জন্য পাঠ্যসূচি করার লর্ড ভ্যালান্টাইনের সুপারিশের তীব্র সমালোচনা করে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, "বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয়। ... কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্তদর্শন সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। ... তবে এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। তার প্রতিষেধক হিসেবে ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরেজী দর্শনের বই পড়ানো দরকার। বার্কলের বই পড়ালে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না, কারণ সাংখ্য ও বেদান্তের মতোই বার্কলে একই শ্রেণীর ভ্রান্ত দর্শন রচনা করেছেন। ... তাছাড়া হিন্দু ছাত্ররা যখন দেখবে যে বেদান্ত ও সাংখ্যের মতামত একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের মতের অনুরূপ তখন এই দুই দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা আরো বাড়তে থাকবে। ... সম্প্রতি আমাদের দেশে ... একটা মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শাস্ত্রে যার বীজ আছে এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে সেই সত্য সম্বন্ধে তাদের ... অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস আরও গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরো বাড়তে থাকে। তারা মনে করেন যেন শেষ পর্যন্ত তাঁদের শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে, বিজ্ঞানের জয় হয় নি।"[৪৮] বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত তাঁর কলেজের জন্য এ সুপারিশ অনুমোদন করেন নি।

সে সময় মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের আধুনিক গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দ আহমেদ, নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের জন্য সচেষ্ট হলেও তা ইউরোপীয় আধুনিক গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বিস্তারের লক্ষ্যে ছিল না। এ ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া ছিলেন ব্যতিক্রম। স্যার সৈয়দ আহমেদ সম্পর্কে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বা 'শিখা গোষ্ঠী'র অন্যতম পথিকৃৎ আবুল হুসেন বলেন, "রামমোহনের মৃত্যুর ১৬ বৎসর পূর্বে এক শুভক্ষণে স্যার সৈয়দের জন্ম হয়। মুসলমানদের এই নিদ্রা ভাঙবার জন্য স্যার সৈয়দই সর্বপ্রথম রামমোহনের পথ অবলম্বন করে স্ব-সমাজকে ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য আহ্বান করলেন। কিন্তু এই আহ্বান আর রামমোহনের আহ্বানের ঢের পার্থক্য ছিল। স্যার সৈয়দ প্রাচীন শাস্ত্রের প্রাধান্যকে পুরোপুরি বজায় রেখে ইউরোপীয় শিক্ষা চর্চার প্রতি স্ব-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এতে করে তিনি শুধু প্রাচীন শিক্ষার সাথে ইউরোপীয় শিক্ষাও সংযোগ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদে সুশোভিত করা, তার বেশি নয়। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামকে পরিপুষ্ট করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নাই। ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর পর্যাপ্তিবোধই এই অনুভূতি তাঁর অন্তরে জাগ্রত হতে দেয় নাই। তৎকালীন মুসলমানরা হয়ত এমন পলিসি না করলে তাঁর কথা গ্রাহ্য করত না, তাতে ফল ঢের ভাল হয়েছে বটে, কিন্তু একটি মারাত্মক ফলও এই হয়েছে যে, রামমোহনের মত খোলাখোলিভাবে না বলায়, মুসলমান ইংরাজী শিখল বটে, কিন্তু তাতে তার জ্ঞান বাড়ল না, কিংবা তার দৃষ্টি পরিষ্কার হলো না, যাতে সে তার প্রাচীন শাস্ত্র মন্থন করে তা হতে নূতন জ্ঞানের সন্ধান দিয়ে মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাসের চর্চা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। ইংরাজীটা তারা যেন শিখল শুধু চাকরি-বাকরির ক্ষমতা অর্জন করবার জন্য, তার বেশি নয়। তাই আধুনিক ভারতীয় মুসলিম

সমাজে বিশ্বের বড় বড় দরবারে সম্মান লাভ করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুব কমই দেখতে পাই। ... একশত বৎসর পূর্বে হিন্দু সমাজ সংস্কৃত শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানকে বরণ করেছিল-আর একশত বৎসর পরে আমরা সেই আরবী শিক্ষাকেই পুনঃপ্রবর্তিত করছি নব-প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহে। প্রাচীন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, সে বুদ্ধি আজও আমাদের হয় নাই। আজ তাই আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে একটুখানি ইংরাজী জুড়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিচ্ছি।"[৪৯]

হাসান গারদেজি ও জামিল রশিদ এর সম্পাদনায় 'পাকিস্তান, ধর্ম ও দ্বন্দ্বের রাজনীতি' বইতে লেখা হয়েছে, "ভারতের স্যার সৈয়দ আহ্মেদ (১৮১৭-৯৮) ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের এক আন্দোলন শুরু করেন যা কালক্রমে পাকিস্তান আন্দোলনের জন্ম দেয়। এটা লক্ষ করা যায় যে দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামের মাঝে পুনরুত্থানবাদ ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বের কখনোই ফয়সালা হয় নি এবং এ বিষয়টি অস্বীকার করা অর্থহীন। আধুনিকতা শব্দটির অর্থ, যে-অর্থে ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহ গ্রহণকে বোঝায়, তা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারটিতে কিছু রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পুনরুত্থানবাদ ও আধুনিকতার মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি নামে পরিচিত মোহাম্মদ ইকবালের চিন্তার মধ্যে সবচে' বেশী প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।"[৫০]

বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দদের হিন্দু ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী ধারায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের জোয়ারের সামনে বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, শরৎচন্দ্রের ইহজাগতিক ভাবধারা যেমন মার খেল তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বোসের নেতৃত্ব পরাস্ত হলো। অন্যদিকে স্যার সৈয়দ আহমেদ, আল্লামা ইকবালের মুসলিম ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী ভাবধারার ধারাবাহিকতায় মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বের সামনে বেগম রোকেয়া, নজরুলদের অসাম্প্রদায়িক ধারা যেমন পরাস্ত হলো তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সাম্প্রদায়িক ভাবধারামুক্ত ফজলুল হক, ভাসানী, আবুল হাশিমদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বও মুসলিম লীগ আন্দোলনে চাপা পড়ে গেল। এই অবস্থার সুযোগ ইংরেজরা গ্রহণ করেছে। সাম্প্রদায়িক বিভাজনে ভারত হয়েছে, আর দ্বি-জাতি তত্ত্বে পাকিস্তান জন্মলাভ করেছে ১৯৪৭ সালে। তৎকালীন পূর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) বাঁধা পড়লো নতুন ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে-পাকিস্তানী প্রায়-ঔপনিবেশিক শাসনে।

পাকিস্তান আমলেও সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলো

বৃটিশ শাসনের অবসানের পর পরই ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর হতে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে করাচীতে ৫ দিনব্যাপী যে শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল তার মূল সুর ছিলো, "পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে; তবে তার নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহনশীল ও ন্যায়-নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।" ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ঔপনিবেশিক শাসনের কবলে পতিত পূর্ব বাংলার জন্য কি রকম হবে তা ছিল পরিষ্কার। যদিও সেক্যুলার চেতনার বিপরীতে স্কুল-কলেজে ইত্যাদি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানী ভাবধারা নিয়ে যাওয়াই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি মাদ্রাসাগুলোকে ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার স্থলে নিউ স্কীম মাদ্রাসা নাম দিয়ে কথিত ইসলামী সংস্কৃতির বাতাবরণে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি ও একটি বশংবদ শ্রেণী তৈরি করাও ছিল তাদের অন্যতম অভিপ্রায়। তবে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই যেহেতু স্বৈরাচারী শাসন-স্বার্থের অনুকূল এবং ফ্যাসিবাদী মানসিকতার পরিপূরক কথিত ইসলামীকরণের ধাঁচে তারা গড়ে তুলতে চেয়েছে, সেজন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে আলাদাভাবে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। তাছাড়া পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে শিক্ষার সংকোচন নীতি সদা বলবৎ থাকায় মাদ্রাসা সংখ্যায় ততটা বাড়তে পারে নি।

স্বাধীন দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়েছে

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ ঘোষিত হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক চেতনাভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা বলবৎ থাকলো। পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যায়-জবরদস্তির বিরুদ্ধে, শিক্ষার অধিকারসহ গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার আদায় ও সংরক্ষণের দাবিতে অসংখ্য আন্দোলন হয়েছিল। এর একটিতেও মাদ্রাসা ছাত্রদের

অংশগ্রহণ ছিল না। কারণ মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা নিয়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা, বিজ্ঞানমনস্ক ইহজাগতিক চেতনা ও যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মৌলিক মানবাধিকারসমূহের কোন বোধই ছাত্রদের মনন জগতে সঞ্চারিত হতে পারে নি। বরং ধর্ম শিক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকেই যে বিকশিত করে তোলা হয়েছিল তার প্রকাশ দেখা গেছে রাজাকার, আল-বদর, ঘাতকবাহিনীর সদস্যরূপে বিপুল হারে মাদ্রাসা ছাত্রদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে। বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীও ইতিহাসের এ শিক্ষাকে নতুন আঙ্গিকে নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। সামরিক শাসনামলে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিবিরোধী চেতনা বিস্তারের মাধ্যমে স্বৈরাচারী-স্বেচ্ছাচারী শাসন বলবৎ রাখার স্বার্থে ধর্মশিক্ষার নামে তারা মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছিল। বর্তমানেও সে ধারা অব্যাহত রয়েছে।

স্বাধীনতার আগে পাকিস্তান আমলে ১৯৪৭-৪৮ সালে দাখিল-আলিম মিলে মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৩৭৮টি (২২৪টি ও ১৫৪টি)। দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন ১৯৭২ সালে দেশে মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ১৩৫২টি। খুদা কমিশনের রিপোর্ট মোতাবেক ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশে মাদ্রাসার সংখ্যা ঃ দাখিল ৭৬৫টি, আলিম ৩০২টি, ফাজিল ৩০০টি ও কামিল ৪৫টি, সর্বমোট ১৪১২টি।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাদ্রাসা বোর্ডের নথীভুক্ত মোট মাদ্রাসা ৬৯০৬টি, যার মধ্যে ৪৮২৬টি দাখিল, ৯৯৬টি আলিম, ৯৫৮টি ফাজিল এবং ১২৬টি কামিল মাদ্রাসা। জাতীয় শিক্ষা কমিশন - ২০০৩ প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ১১৭৪৬টি। এ সব মাদ্রাসার বাইরে এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ১৮ হাজারের বেশি। মিঞা কমিশন বলেছে যে এর বাইরেও পৃথক মহিলা মাদ্রাসা এবং বিজ্ঞান, কম্পিউটার কারিগরি শিক্ষা বিষয়ের মাদ্রাসাও রয়েছে। ইদানিং তথাকথিত ক্যাডেট মাদ্রাসা, ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসার প্রাদুর্ভাবও বেশ বেড়ে গেছে।[৫১]

একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, স্বাধীন দেশের প্রায় প্রতিটি সরকারই, তাদের পরিচয় যাই হোক-নির্বাচিত কিংবা অনির্বাচিত, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী অথবা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী, সামরিক কিংবা বেসামরিক-এরা সকলেই রাজনৈতিক প্রয়োজনে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। যে কারণে আমরা দেখি আওয়ামী লীগের শাসনামলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ গর্বের সাথে বলেন যে তিনি মাদ্রাসা উন্নয়নের জন্য অন্যদের তুলনায় ১০০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ করেছেন। আর বিএনপির প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন যে তিনি তার মাসের বেতনের টাকা মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য দান করবেন। অথচ এরা নিজেরা কেউই তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পড়ান নি।

আমাদের দেশে বিভিন্ন স্তরে মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয় মোটামুটি নিম্নরূপঃ-

ক. এবতেদায়ী স্তরে রয়েছে কোরান, আরবি (২ পত্র), আকাইদ ও ফিকাহ্ এবং বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান, শরীরচর্চা।

খ. দাখিল ও আলিম সাধারণ স্তরে রয়েছে কোরান, হাদিস, ফিকাহ (২ পত্র), বাংলা, ইংরেজি, উর্দু/ফার্সি, ইসলামের ইতিহাস, বালাগত ও মানতেক। আলিম মুজাব্বিদ সাহির বিভাগে অতিরিক্ত বিষয় ও বাংলা ছাড়া সবই ইসলাম ধর্মীয় বিষয়। তবে আলিম বিজ্ঞান বিভাগে ১০ টির মধ্যে ৪ টি ধর্মীয় বিষয় ও বাকি ৬টি বাংলা, ইংরেজি, পদার্থবিদ্যা (২ পত্র) ও রসায়ন শাস্ত্র (২ পত্র)।

গ. ফাজিল স্তরে বাংলা ব্যতীত আর সবই কোরান, হাদিস ও আরবি ভাষাভিত্তিক ধর্মীয় বিষয়। ইংরেজি ও বাংলাসহ ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়সমূহ ৯টি বিকল্পের মধ্যে ১টি হিসেবে বেছে নেওয়া যায়।

ঘ. কামিল বা উচ্চতর ডিগ্রির জন্যে বর্তমানে চারটি বিষয়ের ব্যবস্থা আছে-হাদিস, ফিকাহ, তাফসির ও আদব বা আরবি সাহিত্য।

আবুল মোমেন লিখেছেন, "... বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে যেমন তেমনি সরকারি উদ্যোগেও যে মাদ্রাসার সংখ্যা ও ছাত্র বৃদ্ধির প্রয়াস রয়েছে তা বাজেট বরাদ্দ, এ ধারার কার্যক্রম সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার অর্থায়ন-ইত্যাদিতে বোঝা যায়। ... মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, মসজিদ সমাজ, বাংলাদেশ ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামিক একাডেমি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী ভাবধারার কেজি স্কুলসমূহ ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার যে বিপুল নেটওয়ার্ক সরকার, ইউনিসেফ, নোরাড, এশীয় উন্নয়ন

ব্যাঙ্ক, ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন দেশী বিদেশী সরকার ও সংস্থার বিপুল অর্থে পরিচালিত হচ্ছে ...। এর বাইরে মসজিদকেন্দ্রিক যেসব মক্তব-মাদ্রাসা রয়েছে তাতেও বিপুল ছাত্র রয়েছে। ...

ব্যবস্থাপনা, উদ্দেশ্য ও পাঠক্রমের দিক থেকে দেশে চার ধরনের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে- ১. মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সরকারি অনুদান দ্বারা পরিচালিত মূল ধারার মাদ্রাসা (এগুলো সাধারণের মাঝে সুন্নী মাদ্রাসা নামে পরিচিত যদিও সুন্নিয়তের দাবি নিয়ে মত-পার্থক্য বিস্তর); ২. কওমি মাদ্রাসা-যেগুলো সাধারণ সরকারি অনুদান গ্রহণ করে না, তবে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন উৎস থেকে চাঁদা নেয় (এগুলো সাধারণভাবে ওয়াহাবী মাদ্রাসা নামে পরিচিত); ৩. মূলত আমপারা ও কোরান পাঠ শিক্ষায় নিয়োজিত মক্তব, এবং ৪. সরকারি-বেসরকারিভাবে গৃহীত প্রকল্পভিত্তিক সাময়িক বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচি।

মক্তব ও মসজিদ সংলগ্ন অন্যান্য শিক্ষালয়, মসজিদ, সমাজের গণশিক্ষা কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক সমন্বিত উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষাবিস্তার প্রকল্পের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ সাধারণত একক শিক্ষক-নির্ভর। ইনি প্রধানত মসজিদের ইমাম, সনাতন মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছেন যাঁরা ইমাম প্রশিক্ষণ, গণশিক্ষা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নামে শিক্ষকতায় সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই প্রশিক্ষণ শিক্ষার যুগোপযোগী চাহিদা পূরণের জন্যে যথেষ্ট নয়।

... .. পাঠাগার, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জাতীয় দিবস পালন, প্রভাতী সমাবেশ ইত্যাদিসহ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা জীবনের কোন সুযোগ এসব প্রতিষ্ঠানে নেই। এখান থেকে উন্নত শিক্ষা, মহৎ জীবনবোধ, কোন রকম দক্ষতা, সৃজনশীলতা, ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ একেবারেই অসম্ভব।"[৫২]

স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনামলে ডঃ এ. এম. হারুন-অর-রশিদ লিখেছিলেন, "কিন্তু বর্তমানের দিকনির্দেশনাহীন, ভাসমান সরকারের পক্ষে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী কোন শিক্ষাব্যবস্থার কথা চিন্তা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। এই সরকার গত কয়েক বছর ধরে বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য প্রতি বছর ২০০ কোটি টাকা খরচ করে আসছে যা পুরো শিক্ষা বাজেটের ৯.৩২%। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য বরাদ্দ ১৬৪.৬৫ কোটি টাকা যা শিক্ষা বাজেটের ৭.৬৮% এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সরকারি স্কুলগুলির জন্য বরাদ্দ আর বেসরকারি মাদ্রাসাগুলির জন্য বরাদ্দ একই। সন্দেহ নেই যে মাদ্রাসা শিক্ষার পিছনে বর্তমান সরকার যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঢালছেন তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। শিক্ষামন্ত্রীসহ সরকার দেশকে মধ্যযুগে নিয়ে যেতে চান এ সম্বন্ধে দেশের মানুষ মোটেই সচেতন নয় বলে আমার মনে হয়।

আসলে মাদ্রাসাগুলোর জন্য সরকার যা খরচ করে তার পরিমাণ আরো অনেক বেশি। প্রাথমিক মাদ্রাসাগুলোর জন্য যে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ হয় তা প্রাথমিক শিক্ষা উপখাত থেকেই দেয়া হয়। ফলে এই সব এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য কি পরিমাণ খরচ হয় তা সরকার নিজেও জানে না। তবু প্রতি বছর সরকার বিপুল সংখ্যক দাখিল, আলিম, ফাজিল এবং কামিল তৈরি করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমাজে ছেড়ে দিচ্ছেন যারা দেশের শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির কোন কাজে লাগে না। এভাবে দেশের যুবশক্তির বিরাট অংশকে উৎপাদনবিমুখ করে তুলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করছে বর্তমান সরকার।

এই হতাশাজনক অবস্থার মধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রযুক্তি ও গবেষণা সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। কারণ বর্তমান সরকার আধুনিক একটি সমাজ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চান বলে আমার বিশ্বাস নেই।"[৫৩]

মাদ্রাসা শিক্ষা নৈতিক শিক্ষাকে কতটুকু ধারণ করে ?

মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে প্রধান যে যুক্তিটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে মাদ্রাসা ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা দেয়। সমাজের সর্বস্তরে বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটে চলেছে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে তা দূর করার সম্ভাবনার কথাও বলা হয়ে থাকে।

বাস্তবে এ দাবির কোন প্রাসঙ্গিকতা কিংবা যুক্তি নেই। কারণ বর্তমান পুঁজিবাদী অবক্ষয়ী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই যে নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধসমূহকে সংহার করে চলেছে-এ ঐতিহাসিক ও বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করে যতই ধর্মশিক্ষার কথা বলা হোক না কেন, তা কার্যত নীতিহীনতার পথেই নিয়ে যেতে

বাধ্য। সেজন্যই গত ৩৩ বছরে মসজিদ, মাদ্রাসা শতগুণ বাড়ার পরেও অন্যায়-অপরাধ সিকিভাগও কমেনি, বরং সহস্রগুণ বেড়েছে। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা কি পরিমাণ দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত তা বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত দু'একটা তথ্য থেকে বোঝা যাবে।

"... .. দুর্নীতি দমন ব্যুরো গত ১০ এপ্রিল '৯৫ তারিখে লালবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করে। মামলার অভিযোগে বলা হয়, তৎকালীন উপরেজিষ্ট্রার সাইদুর রহমান খান ও ৩২/২ বাংলাবাজার ঢাকা, হক লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী মাছউদুল হক পরস্পরের যোগসাজসে বিভিন্ন শ্রেণীর ৬ টি বইয়ের বোর্ডের প্রাপ্য রয়্যালিটি আত্মসাৎ করেছেন।

... ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানায় ৫৬টি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত মাদ্রাসা। ... থানার আয়তন ও জনসংখ্যা অনুপাতে যা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ... অন্যদিকে মাদ্রাসা বোর্ডে ভুয়া রেজিস্ট্রেশনে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় ১ লাখ ৬৭ হাজার ৪৮৩ জন রেজিষ্ট্রেশন করে। কিন্তু পরীক্ষায় অংশ নেয় এর অর্ধেকেরও কম।

... একইভাবে মাদ্রাসা পরিদর্শনে বোর্ড থেকে বা মন্ত্রণালয় থেকে পরিদর্শন টিম যাওয়ার আগেই সে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভুয়া মাদ্রাসার প্রধানেরা আশে পাশের ছেলেমেয়েদের জোগাড় করে এনে ছাত্র হিসেবে দেখান। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার জনৈক ডাঃ সামসুল হকের ৪টি ইবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে দেখিয়ে ঐ ৪টি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অনুদান আত্মসাৎ করে।"[৫৪]

"দুর্নীতিগ্রস্ত ও ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত ২৫১টি মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার নামে বছরে প্রায় ১৪ কোটি টাকা অপচয় হয়েছে। ... এর মধ্যে দাখিল (মাধ্যমিক) মাদ্রাসার সংখ্যা ১২৬টি, আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) ৬৯টি, ফাজিল (স্নাতক) ৫৩টি এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) ৩টি। ... .. প্রতি দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার ৮০ শতাংশ অনুদান বাবদ মাসে সরকারের ব্যয় ৩৪ হাজার ৫৯০ টাকা, আলিমে ৩৯ হাজার ৫৪০টাকা, কামিলে ১ লাখ ৬ হাজার ৬২০ টাকা।"[৫৫]

মাদ্রাসা পরিচালনার কর্তাব্যক্তিদের এ সমস্ত অপকর্মের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও নানা ধরনের অপকর্মের সাথে যুক্ত। ২০০৪-এর ১৬ সেপ্টেম্বরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে দেখা যায়, "বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার কুন্দগ্রাম ইউনিয়নের তিলক শিববাটি ফয়জুল কাবির হাফিজিয়া দরসে নিজামী মাদ্রাসার শিক্ষক ক্বারী আব্দুল মজিদ সরদার আস্তে কেতাব পড়ার কারণে ১৭ অবুঝ শিশুর কান কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়, "খুলনায় মাদ্রাসা ছাত্র জবাই : শিক্ষকসহ ৩ জন গ্রেফতার"। ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ধারাবাহিক সংবাদে জানা যায়, খুলনা নগরীর মুসলমান পাড়ার নুরুল উলুম হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ মোহাম্মদ হুসাইন শেখ ওরফে ছোট হুজুর অপর তিন ছাত্রের সহায়তায় ইমরান হোসেন রনি নামের এক ছাত্রকে গলায় ছুরি চালিয়ে জবাই করে হত্যা করে। ২২ সেপ্টেম্বর জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে, কোরান পড়তে আসা ১০ বছরের এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়েছে টেকনাফের মারবাং কুয়ালছড়ি মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আবুল বশর। ২৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেছে, ঢাকার রমনা থানার মগবাজার গ্রীনওয়ে এলাকায় তিন মাদ্রাসা ছাত্র নগরীর শীর্ষ সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরের নামে চাঁদা চাইতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়ে। অল্প সময়ের ব্যবধানে এতগুলো ঘটনা সত্যিই উদ্বেগজনক।

আরবী ভাষায় কোরান হাদীস লিখিত হওয়ার কারণে আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষেরা আরবী ভাষাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। অথচ মাদ্রাসার এ সব বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার সময় কোরান হাদীসের বিভিন্ন অংশ শরীরের বিভিন্ন স্থানে, বাথরুমসহ বিভিন্ন জায়গায় রেখে নকল করতে দ্বিধা করে না। আলিম-ফাজিল-কামিল ইত্যাদি পাবলিক পরীক্ষা চলাকালে নকলের দায়ে বহিষ্কৃত মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর পা ধরে ক্ষমা চাইবার ছবি কিংবা মাদ্রাসাগুলো থেকে বস্তা বস্তা নকল উদ্ধারের ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। নকলের দায়ে মাদ্রাসা ছাত্র কিংবা নকলে সহযোগিতার দায়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদের বহিষ্কার হওয়ার খবরও নতুন কিছু নয়।

হীন রাজনৈতিক স্বার্থেও এসব প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। গত ১৪, ১৫ ও ১৬ আগস্ট ২০০৪ দৈনিক প্রথম আলোতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত দীর্ঘ এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'কক্সবাজার ও বান্দরবানে চলছে ইসলামী জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ : জনশূন্য পাহাড়ে অসংখ্য মসজিদ-মাদ্রাসা ঘিরে গড়ে উঠছে প্রশিক্ষণকেন্দ্র'। তাতে আরও উল্লেখ করা হয়, "বিদেশী ইসলামী এনজিওর অর্থায়নে, ধর্মভিত্তিক দুটি রাজনৈতিক

দলের পরোক্ষ সহায়তায় বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি ও কক্সবাজারের উখিয়ার গহিন জঙ্গলে দুটি শিবিরে রোহিঙ্গা ইসলামী জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র প্রশিক্ষণ চালিয়ে আসছে। দেশের বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসা থেকে বাছাইকৃত ছাত্রদের এসব শিবিরে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে জিহাদি কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।"

শাসকশ্রেণীও কোন নৈতিক বোধ থেকে নয় বরং একটা প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থেই মাদ্রাসার প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। সামরিক স্বৈরশাসনের আমলে মাদ্রাসা বৃদ্ধির হারও তাই ছিল সর্বাধিক। জেনারেল এরশাদের আমলে স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষায় সামঞ্জস্য বিধানের নামে ১৯৮৩ সালে মাদ্রাসার এবতেদায়ী স্তরকে প্রাইমারী, ১৯৮৫ সালে অষ্টম শ্রেণীর মানের দাখিলকে এসএসসি, আলিম স্তরকে এইচএসসি এবং ফাজিল ও কামিলকে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর ডিগ্রির সমমানের করেন।

বিগত আওয়ামী লীগ আমলে প্রণীত প্রফেসর শামসুল হকের শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে 'শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন', 'ইসলামের যথার্থ সেবক ও রক্ষকরূপে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা', ইত্যাদি অসংখ্য কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে 'পুনর্গঠন করে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর' করার সুপারিশ করেছিল।

কমিশনের এই সকল সুপারিশের সমালোচনা করে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর সেদিন বলেছিলেন, "শিক্ষা কমিশন (শামসুল হক কমিশন - সম্পাদনা পরিষদ) কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষার এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও এই কমিশনের অন্য ৫৫ (মূলতঃ ৫৭ জন - সম্পাদনা পরিষদ) জন সদস্যের একজনও তাঁদের কোন সন্তানকে মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রদান করেছেন কিনা এ বিষয়ে তদন্ত করলে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে তাঁরা একজনও তাঁদের কোন সন্তানকেই মাদ্রাসায় ভর্তি করেন নি। তাদেরকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে 'ইসলামের যথার্থ সেবক ও রক্ষক তৈরী করা' অথবা তাদের 'দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন' এর কোন চেষ্টা তাঁরা করেন নি। ... তাহলে 'ইসলামের যথার্থ সেবক' হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষা কাদের জন্য তাঁরা অনুমোদন করছেন? ... ... কেন বাংলাদেশে বর্তমান আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা হবে? প্রধানমন্ত্রী কি নিজের পুত্র-কন্যাকে কোন মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রদান করেছেন? ... .. মাদ্রাসা শিক্ষার বাইরে সাধারণ শিক্ষার মধ্যে উপরোক্ত ধর্মীয় শিক্ষার সুপারিশ থেকে বোঝার কোন অসুবিধে নেই যে, ধর্মীয় শিক্ষাকে সর্বজনীন করার এক ভয়াবহ প্রচেষ্টা এ দেশের শাসকশ্রেণী ও তাদের বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিরা করছে। এদেশের ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাভাবনাকে পাকিস্তানী আমলের থেকেও অনেক বেশি পশ্চাৎপদ রেখে সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রেও একে এক বড়ো রকম বৈষম্য সৃষ্টির চক্রান্ত ছাড়া অন্য কোন ভাবে আখ্যায়িত করা চলে না। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এই ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা হলেও ইংরেজী মাধ্যম ইস্কুল, ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে এই ধর্মীয় শিক্ষার উপর কোন গুরুত্ব নেই। এ গুরুত্ব ষোল আনা প্রদান করার চেষ্টা গ্রাম ও শহরের এমন সব সাধারণ ইস্কুলে হয় যেখানে মধ্য শ্রেণীর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা লাভ করে।"[৫৬]

শাসকগোষ্ঠির মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রীতি প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আলী আনোয়ার লিখেছিলেন, "জেনারেল জিয়ার বিদেশ থেকে আমদানীকৃত শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ খান এসেই ধর্মশিক্ষা এবং আরবী ভাষা স্কুলে বাধ্যতামূলক করার নীতি ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি নিজে স্কুল পরবর্তী শিক্ষা বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রে লাভ করেছেন এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা দিল্লি, বৈরুত এবং লন্ডনে প্রশিক্ষিত হয়েছে। আরবি দূরে থাক, এমন কি মাতৃভাষায় তাঁদের কোন ব্যুৎপত্তি আছে কি না সন্দেহ। ধর্মাচরণের জন্য ড. মজিদ খান অথবা তাঁর অন্য অন্য সহকর্মী সহযাত্রী প্রসিদ্ধ ছিলেন না। পরবর্তী প্রেসিডেন্টের (অর্থাৎ এরশাদের - সম্পাদনা পরিষদ) মন্ত্রীবর্গও নন। এদের প্রসিদ্ধি অন্যত্র। তা'হলে অকস্মাৎ ধর্মশিক্ষা নিয়ে এই বাগাড়ম্বর, এই তৎপরতা কেন? বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কি অকস্মাৎ ধর্মহীন ও নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে পড়েছে? সে কি সাধারণ মানুষ, না যাঁরা বিত্তবান, যাঁরা ক্ষমতাসম্পন্ন? ... ..

১৯১৩ সনে স্বদেশী আন্দোলন যখন সারা ভারতবর্ষে উত্তাল তখনই দেখি-নাদান শিক্ষা সংস্কার কমিটি মাধ্যমিক স্তরে নীতি শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষার সুপারিশ করেছেন। আয়ুব খান বিরোধী বিক্ষোভ যখন সমাজে জমে উঠেছে তখনই গভর্নর মোনেম খান ইসলামী ও আরবী বিশ্ববিদ্যালয় মিশন গঠন করছেন। সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন রাজনৈতিক দলগুলো জোটবদ্ধ হচ্ছে তখনই মজিদ খান ইসলামী শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। যখন মিলিত বিরোধী দলের

আন্দোলনে জনতার বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ সারা দেশের রাজপথগুলোতে বিস্ফোরিত হচ্ছিল-তখনই রাষ্ট্রীয় ধর্মের ঘোষণাটি ... ঘটেছে। জনসাধারণের বিক্ষোভের প্রতিপক্ষে ক্ষমতাসীনদের এই ধর্মপ্রীতি সৎও নয়, আকস্মিকও নয়, তা রাজনৈতিক তাৎপর্যমন্ডিত। এর উদ্দেশ্য হ'ল জনসাধারণের ধর্মসংক্রান্ত আবেগকে আলোড়িত করে তার বিক্ষোভকে প্রশমিত করা এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনাকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া। মোনায়েম খান বা জিয়াউল হক ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মাচরণ করতেন কি না, সেটা প্রশ্ন নয়, এর চেয়ে বড় প্রশ্ন রাজনৈতিক দুর্নীতি ও দুঃশাসনকে তারা ধর্মের জিগীর তুলে আড়াল করার চেষ্টা করছেন কি না? এখনো তাই ঘটছে কি না এটা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। ভূতের মুখে রামনাম সন্দেহের উদ্রেক করে বৈ কি।"[৫৭]

একসময়ের তালেবান-আল কায়েদা সৃষ্টিকারী এবং বর্তমান সময়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনাকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরও মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ লক্ষণীয়। ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ডেইলী স্টারে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাদ্রাসা শিক্ষক ও ইমামদের প্রশিক্ষণ দিতে আগ্রহী।" ৬ অক্টোবর বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মদিনাতুল উলুম মহিলা কামিল মাদ্রাসা ও তানজিমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদ্রাসার ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে আমেরিকান সেন্টারে এনে ইংরেজি শেখানোর বৃত্তি প্রদান করেছে। দুইশত বছর আগে ইংরেজদের মাদ্রাসাপ্রীতি আর বর্তমানে মার্কিনীদের উৎসাহকেও তাই সম-বিবেচনায় রাখা দরকার।

৩৩ বছর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি এবং সাধারণ শিক্ষায় ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পরও যখন বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পর পর তিন বার প্রথম স্থান দখল করে, তখন কি একথা বলা নিতান্তই অসঙ্গত হবে যে কথিত এই মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজে নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধের কোন জাগরণ ঘটাতে পারে নি?

মাদ্রাসা ছাড়াই ধর্মশিক্ষা সম্ভব

যে কোন জ্ঞানপিপাসু মানুষের জন্যই ধর্মশিক্ষা তার ইতিহাস চেতনার জন্য প্রয়োজন। ইতিহাসের কোন্ কালপর্বে কোন্ ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলো সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে কখন কি ভূমিকা রেখেছিল এবং তার পরিণতি কি-এ সকল বিষয়ে ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা অর্জন করাই হলো ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা। জে. ডি. বার্নাল লিখেছিলেন, "সভ্যতার আদি পর্বে পৃথিবীর প্রত্যেকটি বড়ো বড়ো ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল বিক্ষোভমথিত যুগে। একেবারে মূলগত এবং জরুরী সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পেই প্রতিটি ধর্মের উদ্ভব। কনফুসিয়াস, লাওৎসে, বুদ্ধ, মহাবীর, জরথ্রুষ্ট, হিব্রু, ঋষিরা, যিশু খৃষ্ট এবং মুহম্মদ-তাঁরা প্রত্যেকেই প্রবল অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের পর্বে তৎপর ছিলেন। নিজ নিজ যুগের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে এঁরা প্রত্যেকেই তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই মানুষের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে নতুন ছক তৈরি করেছিলেন। ... .. শুধু তাই নয়, সংস্কারকরা প্রায় দাবি করতেন যে তাঁরা অতীতের অপেক্ষাকৃত ন্যায়পরায়ণ ও সুস্থিত সমাজ-সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন মাত্র। কিন্তু সমাজজীবনে তো তখনো পিছু হাঁটা যায় না; তাই জেনেই হোক বা না জেনেই হোক, বড় বড় ধর্ম সংস্কারকরা প্রত্যেকেই নতুন নতুন সমাজ-সম্পর্কের উদ্ভাবক হয়ে উঠেছিলেন। কাজেই মিশর, ব্যাবিলোনিয়া আর গ্রীসের প্রকৃতি-বিষয়ক দার্শনিকরা যেমন ভৌত বিজ্ঞানের বনেদ তৈরি করে দিয়েছেন, এঁরাও তেমনি সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করে দেন।"[৫৮]

একজন মানুষ; তিনি মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খৃষ্টান যেই ধর্মের লোকই হোন না কেন, তিনি সকল ধর্মের উত্থান, বিষয়বস্তু, মূল্যবোধ সম্বলিত সামাজিক আন্দোলন-সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা এবং ধর্মসাধক মহান মানুষদের চরিত্র, জীবন সাধনা এবং তাদের আবির্ভাবের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ইত্যাদি বিষয় জানা দরকার। নইলে ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায় অজানা থাকবে। সমাজতত্ত্বের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। এবং সমাজবিজ্ঞানের এ জ্ঞান ছাড়া আধুনিক নৈতিকতার দিশাও পাওয়া যাবে।

একটা নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের অভ্যন্তরে সমাজ বিকাশের যে নিয়ম-নীতি কার্যকর থাকে, তার সাথে সংগতিপূর্ণ জীবনাদর্শ ও জীবন সংগ্রামের মধ্যেই নৈতিকতা ফুটে উঠে। নৈতিকতার কোন শ্বাশ্বত রূপ নেই। একটা সময়ে একটা আদর্শ যে নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি করেছিল, তার কার্যকারিতা হারাবার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট নৈতিকতার মানও নেমে যেতে বাধ্য। এ সত্য অনুধাবন না করলে নৈতিকতার দোহাই দিয়েই আমরা অনৈতিকতার পঙ্কে ডুবতে থাকবো।

অধ্যাপক আলী আনোয়ার লিখেছেন, "মাদ্রাসা কমিশনসমূহ যখন সরল বিশ্বাসে ঘোষণা করেন যে মাদ্রাসাসমূহের লক্ষ্য হ'ল যথাযথ মুসলমান তৈরি করা তখন ভাবতে অবাক লাগে যে তাঁরা ভুলে যান কি করে যে গত ১০০ বছর ধরে এদেশে যে সব মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও ইসলামী চিন্তানায়ককে আমরা বরেণ্য বলে মনে করে এসেছি তাঁরা সবাই 'ধর্মহীন' পাশ্চাত্য শিক্ষার ফসল ? মীর মোশাররফ হোসেন, আমির আলী, মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, এমদাদ আলী, আব্দুল হামিদ খান, ইয়সুফ জাই, ফজলুল করিম, আকরাম খান, ইব্রাহিম খান, আবুল হাশেম, এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন, মনসুর উদ্দিন, ডঃ শহীদুল্লাহ, আব্দুল হক ফরিদী এঁরা-এর বিক্ষিপ্ত ক'টি উদাহরণ মাত্র ।"[৫৯]

এ বিষয়গুলো বুঝতে না পারলে ধর্মপ্রাণ মানুষেরাও আজ ধর্মব্যবসায়ী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির স্বরূপ বুঝতে পারবে না। কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে নিজের মনের ও সামাজিক পরিবেশের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবে না। সেজন্যই আজ উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের মতই ধর্মশিক্ষার বিষয়টিকে দেখতে হবে। শিক্ষানীতিতে তাই একই ধারার আধুনিক শিক্ষার উচ্চস্তরে ধর্মশিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

মাদ্রাসা শিক্ষার দুর্বলতা, অকার্যকারিতা নিয়ে যখনই কোন আলোচনা হয় তখন মাদ্রাসা শিক্ষকদের মধ্যে চাকুরি হারানোর ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কোটি কোটি মানুষকে বেকার করে রেখেছে। চাকুরি চলে গেলে চরম আর্থিক সংকটে পড়তে হবে। ফলে 'মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন নেই'-এ কথা বললে চাকুরি হারানোর আতঙ্ক তাদেরকে ব্যাকুল করে তোলে। 'মাদ্রাসা বিপন্ন'-এ জিগির তুলে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল যে উম্মাদনা সৃষ্টি করে তা মূলত শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পনাকেই বাস্তবায়নে সহায়তা করে। মাদ্রাসা শিক্ষকরাও এর শিকারে পরিণত হন। দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘোলাটে আবহাওয়ায় দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাদের স্বার্থ উদ্ধার করে নেয়। মাদ্রাসা-ছাত্রদেরও একটা রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে ব্যবহার করে।

ফলে আজ দেশের উন্নতির স্বার্থে, সত্যিকারের ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনে, গরিবের প্রতি ধনিকশ্রেণীর এই নির্মম ধর্মীয় প্রতারণা ও পরিহাস থেকে মুক্তির জন্য যুক্তির পথে আসতে হবে। সাহসের সাথে সত্য বলতে হবে। একই পদ্ধতির শিক্ষা চালু করতে হবে এর অর্থ এই নয় যে, মাদ্রাসা শিক্ষকদের কর্মচ্যুতি যুক্তিসঙ্গত। মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া এবং বাকিদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তাদের বেতন ও ভাতা প্রদান করতে হবে।

শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও নৈতিকতাকে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে

শিক্ষা মনুষ্যত্বের বাহন। সেজন্যই শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করা চলে না। ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্কে জড়িয়ে দর-দাম যাচাই-এর মাধ্যমে আর যাই হোক, শিক্ষা হয় না। বৈষয়িক ও ভাবগত উৎপাদন সংগ্রামের মধ্যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে নিয়োজিত বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের ভূমিকা এক হয় না, ব্যক্তিগত অবদান-অর্জনেরও তারতম্য ঘটে। কিন্তু তা যখন মানুষের কাছে জ্ঞানরূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং জ্ঞানভান্ডারে জমা হয়, তখনই তা মানবজাতির সম্পদে পরিণত হয়। নিউটন-আইনস্টাইন তাঁদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কিংবা শেক্সপিয়ার-রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সাহিত্যকর্ম কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য উইল করে যান নি। ফলে পূর্ব-প্রজন্মের মানুষের অর্জিত জ্ঞানের উপর পরবর্তী প্রজন্মের সকল মানুষের সমান অধিকার জন্মায়। যদিও শোষণের সমাজে শাসকগোষ্ঠী তার স্বীকৃতি দিতে চায় না।

শিক্ষা যখনই বাণিজ্যিক পণ্য হয়ে ওঠে, তখনই শিক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নষ্ট হয়ে যায়। পুঁজিবাদী সমাজের সকল ক্ষেত্রে শোষণ-বঞ্চনা সইতে সইতে আজ আমাদের অবস্থা এমনই হয়েছে, শিক্ষা যে আমাদের মৌলিক-মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার, এটা কোন সুবিধা নয়, তাও আমরা ভুলতে বসেছি। কল-কারখানা আর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণ করা হচ্ছে। এক দল পুঁজিপতি শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগ করছে এবং চড়া দামে শিক্ষা বিক্রি করে মুনাফা তুলে আনছে। এর ফলে সাধারণ শিক্ষার মান দ্রুত নেমে যাচ্ছে, দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ আরও সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

অতীতের বেসরকারি শিক্ষা প্রসঙ্গে এখানে কিছু বলে রাখা দরকার। আমাদের দেশে বর্তমানে মানসম্মত শিক্ষার জন্য যেসব স্কুল-কলেজ বিখ্যাত তার অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ বা পাকিস্তান আমলে, বেসরকারি উদ্যোগে। এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তারা ছিলেন তৎকালীন ঔপনিবেশিক

শাসন-শোষণবিরোধী সংগ্রামের সাথে যুক্ত শিক্ষানুরাগী মানুষেরা। সেদিন তাদের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে দেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে শাসকদের সাথে পাল্লা দিতে যোগ্য করে গড়ে তোলা। সেজন্য তাদের চেষ্টাই ছিল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষার আর্থিক দায়ভার থেকে মুক্ত রাখা। কিন্তু হাল আমলে পুঁজিপতিদের উদ্যোগে যে সব তথাকথিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলোর উদ্দেশ্যই হলো ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নানা ফি চাপিয়ে, প্রতারণা করে মুনাফা লোটা।

বাংলাদেশের শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণের ধারাটি শুরু হয়েছিল কয়েক দশক আগে, বিভিন্ন ধরনের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। কিন্তু তখন সংখ্যায় সীমিত থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে এগুলোর বেশ প্রসার ঘটেছে। এমনকি কোন কোন থানায়ও এগুলো বিস্তৃত হয়েছে। ছাত্রদেরকে বেতন দিতে হয় একশত-দেড়শত টাকা থেকে তিন-চার হাজার টাকা। এমনকি ত্রিশ-বত্রিশ হাজার টাকা মাসিক বেতনের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলও এখন দেশে চালু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দেহে-মনে বিকশিত করার কোন ব্যবস্থাই এসব প্রতিষ্ঠানের নেই। খেলার মাঠ নেই, সাঁতার কাটা বা শরীর চর্চার জন্য পুকুর বা জিমনেসিয়াম নেই। যে লাইব্রেরি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে তাও নেই। দেখা যায়, কেবলমাত্র একটা বিল্ডিং, কোথাও শুধুমাত্র একটা ফ্ল্যাট, কিছু চেয়ার-টেবিল-এ নিয়েই নাম দেয়া হয় কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট স্কুল ইত্যাদি।

এ অবস্থা সত্ত্বেও এসব প্রতিষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল মানুষেরা তাদের সন্তানদের পাঠাতে একভাবে বাধ্য হয়। কারণ ১৯৯২ সাল থেকে আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও এখন প্রায় ৫১ হাজার গ্রামে কোন সরকারি প্রাইমারী স্কুল নেই, যেগুলো আছে সেগুলোর খুবই জরাজীর্ণ অবস্থা। ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক নেই, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই। ফলে চূড়ান্ত একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। মাধ্যমিক ক্ষেত্রেও অবস্থা তথৈবচ। আমাদের দেশে এখনও মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে একটু মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য সরকারি স্কুল-কলেজই হলো প্রধান ভরসা। অথচ কোন জেলায় দুটোর (ছেলেদের একটা, মেয়েদের একটা) বেশি সরকারি স্কুল নেই। খোদ রাজধানীতেই লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সরকারি স্কুল মাত্র ২৪টি। ফলে প্রতি বছর জানুয়ারি মাস আসলেই মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে ভর্তির জন্য ত্রাহি-ত্রাহি রব উঠে যায়।

ইদানিং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়েও অক্সফোর্ড, স্ট্যামফোর্ড, স্টেট, ইমপেরিয়াল প্রভৃতি চটকদার নামের বেশ কিছু ব্যয়বহুল বেসরকারি কলেজ গড়ে উঠেছে। এসব কলেজে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে বাধ্য হয় সরকার সে ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। সরকার দেশের বিভাগীয় ও বড় জেলা শহরগুলোতে অবস্থিত খ্যাতনামা ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী বন্ধ করে দিয়েছে। ঢাকা কলেজসহ আরও ১২টি কলেজ এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ইতোমধ্যেই ঢাকার ইডেন কলেজ, তিতুমীর কলেজ, রংপুরের কারমাইকেল কলেজ, যশোরের এমএম কলেজ, সিলেটের এমসি কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজসহ বেশ কয়েকটি কলেজে উচ্চমাধ্যমিক বন্ধ করে দিয়েছে। এখন এমনিতেই সারা দেশে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে স্বল্প খরচে একটু ভাল লেখাপড়ার জন্য কলেজ খুবই কম। খোদ ঢাকা শহরেই হাজার হাজার ছাত্রের জন্য উচ্চমাধ্যমিক সরকারি কলেজ মাত্র ৫টি। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, ছাত্রীদের জন্য সরকারি কলেজ মাত্র ১টি। ময়মনসিংহ শহরে ছাত্রদের জন্য কোন সরকারি কলেজই নেই। সারাদেশে সরকারি উচ্চমাধ্যমিক কলেজ মাত্র ১০টি! এ অবস্থায় স্বচ্ছল মানুষ ছাড়া আর কারও পক্ষে কি তাদের সন্তানদের উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো সম্ভব হবে?

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা আরও ভয়াবহ। পাশের হার গড়ে ৪০ থেকে ৫০ ভাগের উপরে না উঠলেও প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে দুই থেকে আড়াই লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী। এদের মধ্যে মাত্র ২৪,০০০ ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি হতে পারে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪ দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও ৫৫ হাজার ৫৯২ জন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য কোথাও ভর্তি হতে পারবে না। ... এইচএসসি পরীক্ষায় এ বছর পাস করেছে ২ লাখ ৩০ হাজার ৯২ শিক্ষার্থী; কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবমিলিয়ে আসনসংখ্যা রয়েছে ১ লাখ ৮০ হাজার। ... পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আসনসংখ্যা আছে মাত্র ১৯ হাজার ৪০০। এর মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) আসন রয়েছে ৮১০টি, সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ১ হাজার ৫০০টি। ... বেশকিছু কৃতি শিক্ষার্থী পাবলিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করেও তার কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না।"

ভর্তির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় এক বিশাল অংশের ছাত্র-ছাত্রী চলে যায় বিদেশে। এ অবস্থায় সরকার নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার দায়িত্ব এড়িয়ে ১৯৯২ সালে 'বেসকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন' পাশের মাধ্যমে শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণের ষোলকলা পূর্ণ করেছে। এই আইন পাশের পর ইতোমধ্যেই ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে বেশ কয়েকটি। এগুলো নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও কার্যত ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মতো। 'শিক্ষার চমৎকার পরিবেশ ও অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা' এবং 'ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এফিলিয়েশন'-এর কথা বলে এরা পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেয়। কিন্তু বাস্তবে এদের ন্যূনতম অবকাঠামো নেই। রাজধানী ঢাকার অভিজাত এলাকায় ভাড়া করা বাড়ি কিংবা ফ্লোরে এদের ঠিকানা। প্রতিষ্ঠানগুলোর একটিরও extra-academic কার্যক্রম (খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কর্মকান্ড) নেই। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি), লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ও ন্যূনতম উপকরণ যোগান দিতে এরা ব্যর্থ। দু'একটি ছাড়া কোনটিরই পূর্ণকালীন শিক্ষক নেই।

এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় না বলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা কোচিং সেন্টারের সাথে তুলনা করা যায়। এই তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুরোপুরি উচ্চবিত্তদের দখলে। এগুলোতে চার বছরের অনার্স কোর্স করতে একজন শিক্ষার্থীকে গড়ে তিন থেকে ছয় লাখ টাকা খরচ করতে হয়। যেমনঃ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি কোর্স সমাপ্ত করতে একজন ছাত্রের খরচ হয় ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের এক বছরের টিউশন ফি গড়ে ৮০ হাজার টাকা। রয়েল ইউনিভার্সিটিতে প্রতি সেমিস্টারের টিউশন ফি ১,৫০০ থেকে ৪,০০০ টাকা। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ কোর্সের টিউশন ফি ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৮ শ' টাকা, কম্পিউটার সায়েন্স কোর্সের ফি ৩ লাখ ৬১ হাজার ৬ শ', । ব্রাক ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ ও কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ফি ৫ লাখ ৪৬ হাজার থেকে ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা, স্থাপত্য কোর্সের ফি ৭ লাখ ৬ হাজার। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ২ লাখ ৭০ হাজার এবং ইংরেজির জন্য ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্স-এ বিবিএ কোর্সের ফি ৪ লাখ ৬৪ হাজার, কম্পিউটার সায়েন্স কোর্সের ফি ৪ লাখ ৮৫ হাজার। রয়েল ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ কোর্সের ফি ৩ লাখ ৬ হাজার, কম্পিউটার সায়েন্স কোর্সের ফি ৩ লাখ ৬৩ হাজার এবং ইংরেজি ও অর্থনীতি কোর্সের ফি ৩ লাখ ৬ হাজার টাকা করে। এভাবে হিসেব করে দেখা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা বাবদ একজন শিক্ষার্থীর মাসে খরচ হয় ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা।[৬০]

দেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজও গড়ে উঠেছে। এদেরই একটি হলো ঢাকার মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডে প্রতিষ্ঠিত উম্মাহ মেডিকেল কলেজ। এখানে ভর্তির ক্ষেত্রে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে প্রথমেই ২ লাখ ৯ হাজার টাকা ডোনেশন দিতে হয়। মাসিক বেতন দিতে হয় ৩ হাজার টাকা করে। বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে (BMC) ভর্তি হতেই ন্যূনতম ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হয়। এখানে মাসিক বেতন ১ম ও ২য় বর্ষে ৩ হাজার টাকা এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ষে ৪ হাজার টাকা। হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সময় ৪ লাখ ৬৭ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হয়। সিকদার মহিলা মেডিকেল কলেজে ভর্তি ফি ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এগুলোর মাসিক বেতন ২ থেকে ৪ হাজার টাকা। এই যে বিশাল খরচ, তা মিটিয়ে আমাদের দেশের ক'জন ছাত্রের পক্ষে এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করা সম্ভব?

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/মেডিকেল কলেজের নামে প্রতারণা কোন পর্যায়ে নেমেছে তা বোঝা যাবে গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪ জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত সংবাদ থেকে। এ সকল সংবাদে বলা হয়েছে, সাভারে সরকারি অনুমোদন ছাড়াই বেসরকারি মেডিকেল কলেজ খুলে শিক্ষার্থী প্রতি ৫৫ হাজার থেকে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা করে গত তিন বছরে আড়াইশ' ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে প্রায় তিন কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ অব কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন এন্ড হসপিটাল নামক এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্থানীয় সাংসদরাও অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতারণার বিষয়ে জানতে পেরে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম চৌধুরীকে ৩ দিন তার কক্ষে অবরোধ করে রাখে। পরে স্থানীয় সাংসদ তাকে উদ্ধার করে পুলিশে সোপর্দ করে। একই দিনে প্রকাশিত অপর এক সংবাদে বলা হয়েছে, পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ গত ৮ বছর ধরে প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে যাওয়া শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ করে রেখেছে। ২০০৩ সালে একবার সমাবর্তন করার

ঘোষণা দিলেও শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই সমাবর্তন আয়োজন করতে পারে নি। এদিকে সার্টিফিকেটের অভাবে শিক্ষার্থীরা কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারছেনা।

এর দায়িত্ব কে নেবে? সরকারতো উৎসাহই যোগাচ্ছে। এসবের আশঙ্কা থেকেই শিক্ষানুরাগী অসংখ্য মানুষের মতো অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেছিলেন, "আমাদের দেশে যেমন চিকিৎসা বিক্রয়ের দোকানরূপে ক্লিনিক হয়েছে সেই রকম গত কয়েক বছর ধরে বিদ্যা বিক্রয়ের জন্য ধানমন্ডির বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ভাড়া করে দোকান খোলা হয়েছে। এগুলোর নাম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে একাধারে যুগপৎ বিদ্যা বিতরণ ও সৃষ্টির এবং সংস্কৃতিমান, সমাজ-সচেতন মানুষ সৃষ্টির কারখানা বোঝায়। এজন্যই বিদ্যা বিক্রয়ের জন্য যে দোকানগুলো খোলা হয়েছে সেগুলোর সবগুলো দেশের মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে বিলুপ্ত করা আবশ্যক ও জরুরি।"[৬১]

অধ্যাপক যতীন সরকার বলেন, "শিক্ষায় প্রাইভেটাইজেশনের যে-নীতি সরকারের সোৎসাহ সমর্থন পাচ্ছে সে-নীতি তো শিক্ষাকে শুধু মহার্ঘ পণ্য বানিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে পদদলিত করে শিক্ষাকে পুঁজি ও পুঁজিপতি নির্ভর করে তুলেছে। 'ডোনেশনে'র নামে লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে যে-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি করতে হয় সে প্রতিষ্ঠান কি কোনো নীতি-নৈতিকতার ধার ধারে? ... ওই প্রতিষ্ঠানের নিয়ামকদের কি কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে? প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরির কোনো সুষ্ঠু নীতিমালা তারা অনুসরণ করে কি? শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা বিধান করার কোনো দায়বোধ তাদের আছে কি? ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচি নির্ধারণেও কি তারা রাষ্ট্রীয় বিধানের ও সামাজিক প্রয়োজনের কোনো তোয়াক্কা করে?"[৬২]

আমরাও মনে করি, বাংলাদেশে শিক্ষার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকিকরণের এই যে ধারা চলছে তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার এবং ক্রমবর্ধমান শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা মেটানোর দায়িত্ব হলো সরকারের। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নতুন নতুন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বাণিজ্যনীতি পরিহার করে উঁচু সংস্কৃতি-চেতনা ও মনুষ্যত্বের আধারে দক্ষ মানব-সম্পদ সৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে আরও বহুগুণ সম্প্রসারিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। এজন্য সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ১০ দফা অনুযায়ী শিক্ষাখাতে প্রতি বছর কমপক্ষে জাতীয় বাজেটের ২৫% বরাদ্দ নিশ্চিত করা দরকার।

দেহ-মনে বিকশিত মানুষ হয়ে উঠার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

এক সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ না থাকলে তা সরকারিভাবে মঞ্জুর করা হতো না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে মানুষের শারীরিক, মানসিক, মানবিক, আক্ষরিক, বুৎপত্তিগত ও প্রায়োগিক ক্ষমতা-দক্ষতা ইত্যাদির সুষম বিকাশের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ও পরিবেশকে বুঝায়। সেজন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আলো-বাতাস খেলে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মতবিনিময়ের জন্য বসা-বলা-লেখা ইত্যাদির উপযুক্ত ব্যবস্থাসম্পন্ন শ্রেণীকক্ষ, বই, কম্পিউটার, লাইব্রেরি, হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র, ল্যাবরেটরি, টয়লেট, শিক্ষকদের অধ্যয়ন-গবেষণা ও বিশ্রামের ঘর, মিলনায়তন, ইনডোর খেলার ঘর, খেলার মাঠ ও সরঞ্জাম, পুকুর, ব্যায়ামাগার, সংগীতঘর-ছবিঘর ও সরঞ্জাম ইত্যাদির আয়োজন থাকা আবশ্যক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টি.ভি, ভি.সি.আর., প্রজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, স্বাস্থ্য-পরীক্ষার আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রাখতে হবে। ছবির মাধ্যমে বিশ্বের সেরা কীর্তিসমূহ যাতে প্রদর্শন করা যায় সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রচার মাধ্যমকেও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মানোন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যায়।

শিক্ষা কাঠামোর স্তরায়ন যেমন ২ বছর থেকে ৫ বছর প্রি-প্রাইমারী, ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী প্রাথমিক, ৮ম শ্রেণী থেকে চতুর্দশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক এবং তারপর উচ্চশিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন শৃঙ্খলায় বিভিন্ন মেয়াদের হতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের শৃঙ্খলাকেও সেভাবেই বিন্যস্ত করা যেতে পারে। একটা মানব শিশু জন্মগ্রহণের পর থেকেই শিখতে শুরু করে। সন্তানের মা-বাবা, পরিবারের অপরাপর সদস্য ও আশে-পাশের মানুষদের হাঁটা-চলা, কথা-বার্তা, পারস্পরিক ভাব-ভঙ্গি শিশু রপ্ত করতে চেষ্টা করে এবং পরিবারের সদস্যদের রুচি-অভ্যাস, চরিত্র-ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির প্রভাব নিয়েই শিশু বেড়ে উঠতে থাকে। ২ বছর থেকে ৫ বছর বয়স-এ সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ তখন থেকেই মানুষের জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মিত হয়ে যায়। এজন্য এ সময়

থেকেই দরকার পড়ে একটা প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের। আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, "কেবল সত্যের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অবিরাম সেই জ্ঞান নবায়ন করতে হবে। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ঐতিহ্যের সম্পদ হস্তান্তরের ক্ষেত্র হিসেবে পরিবার আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে।"[৬৩]

কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন, "উন্নত দেশে দুই থেকে পাঁচ-ছয় বছর বয়সের শিশুর শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। এই বয়সে অনেক শিশু স্কুলে একত্রে জড়ো হয়ে খেলাধূলা করে, নক্সা আঁকে, কাঠের বা মোটা কাগজের টুকরো জোড়া দিয়ে অনেক রকম প্যাটার্ন বা আকৃতি তৈরি করে; চিত্র-বিচিত্র বইয়ের ছবি দেখে, কাঠের অক্ষর দিয়ে খেলা করতে করতে শব্দ তৈরি করতে শেখে, বস্তু গণনা করতে করতে সংখ্যার ধারণা লাভ করে, আশে-পাশের সাধারণ জিনিস ও পশু-পাখীর নাম শেখে, মজার মজার ছড়া আবৃত্তি করে। এই ধরনের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে দিয়ে সহজে ও স্বাধীনভাবে তাদের আপন-আপন স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর চর্চা হতে থাকে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ধৈর্য ধরে অনেকটা অলক্ষ্যে প্রত্যেকটি শিশুর বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করে সেইসব দিকে ওদের বিকাশ লাভের সুযোগ করে দেন। এইভাবে, বেত ও ধমকের সাহায্য ছাড়াই শিশুরা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে।"[৬৪]

আমাদের দেশে গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৬৭ ভাগ মানুষ ভূমিহীন এবং দিনমজুর। এদের অধিকাংশেরই স্থায়ী ঠিকানা নেই, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নেই। যাদের ঠিকানা আছে তাদেরও সন্তান-সন্ততির জন্য পুষ্টিকর খাবার যোগাড় করা কিংবা পড়াশুনার উপকরণ ও সরঞ্জাম কেনার সাধ্য নেই, সেগুলি ঘরে রাখার জায়গা নেই। দরিদ্র এই মানুষদের এক বিশাল অংশেরই স্থায়ী পারিবারিক বন্ধন বলে কিছু নেই। এসব পরিবারের মায়েরা বেশিরভাগই নিরক্ষর এবং আধুনিক ধ্যান-ধারণা বর্জিত। শহুরে শ্রমিক পরিবারগুলোও শহরে স্থায়ী হতে পারছে না। শিল্প এলাকায় যারা বাস করে তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা সেখানে থাকে না। বস্তিগুলোতে তো এসবের কোন বালাই নাই। এভাবে গ্রাম-শহরের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শিশু সন্তানরা বাল্যকাল থেকেই বেড়ে উঠছে অনাহারে-অপুষ্টিতে, অবহেলা আর অযত্নে, কূপমন্ডূকতা-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পরিবেশে অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সামনে রেখে। ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়ে উঠতে দিলে এরা শিক্ষিত মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পিছিয়ে থেকে মানব-অস্তিত্বকেই সংকটাপন্ন করে তুলবে। এরাই তো ভবিষ্যৎ; এদের রক্ষা করতে না পারলে, প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথ করে দিতে না পারলে, ভবিষ্যতের কাছে আমাদের সভ্যতার দাবি দাঁড়াবে কোন্ যুক্তিতে? তাই ২ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত সময়কালের সকল শিশুর জন্য প্রত্যেকটি প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন প্রি-প্রাইমারী, নার্সারী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আয়োজন থাকা দরকার। এ শিশুদের রাষ্ট্রীয় পরিচর্যায় খাদ্য, পোষাক, খেলনা, শিক্ষার অন্যান্য উপকরণসহ স্বাস্থ্য সুবিধা ও নিরাপত্তা প্রয়োজন। যেসব পরিবারে এ সকল শিশুর রাত্রি যাপনের মতো ব্যবস্থাও নেই-সেসব শিশুদের জন্য ২৪ ঘন্টার আবাসিক ব্যবস্থা করা দরকার।

বিত্তশালী পরিবারের শিশুদেরও এ-ধরনের পরিচর্যার আওতায় আনা প্রয়োজন। কারণ তারাও পরিবারিক প্রাচুর্যের পরিবেশে মানসিক দৈন্য নিয়ে বেড়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "... .. অনেকের ঘরে বালক-বালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্তানী শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলা সমাজ হইতে যে শত-সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল স্বজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়-অথচ ইংরেজী সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাদিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। ... শিশু-অবস্থায় যে-সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিবে?"[৬৫]

কবি বর্ণিত প্রায় অনুরূপ অবস্থা আমাদের দেশের ধনী পরিবারের সন্তানদের 'মানুষ করে তোলা'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদিও একথা ঠিক যে, বর্তমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বহাল রেখে এ-ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন দুঃসাধ্য। তা-সত্ত্বেও আমাদের সর্বনাশের মাত্রা যাই হোক, পরবর্তী প্রজন্মকে এ অভিশাপের হাত থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত রাখার জন্যই এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন দরকার।

এ-সমাজের অন্য সকল প্রতিষ্ঠান পরিণত মানুষদের নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের শৃঙ্খলা বিধান করে। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে এমন এক সুসঙ্গত আয়োজনের শৃঙ্খলা যা বস্তুগত, ভাবগত, দৃশ্য-অদৃশ্য বহু বিচিত্র ধারার মানব অর্জনসমূহকে গ্রথিত করে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে নিশ্চিত করে। নিরানন্দ একঘেয়ে জীবন ও কর্মধারার বাইরে আনন্দ-উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে জ্ঞান ও চরিত্রের একের পর এক সোপান অতিক্রম করে জীবনকে প্রবাহিত করে। এই পুরনো প্রবাহ সমাজের মধ্যে নতুন সমাজের কর্মশক্তি এবং চেতনা-বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটায়। ফলে কোনভাবেই শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের গুরুত্বকে খাটো করে বা অপ্রধান করে দেখলে চলবে না। অতীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনালগ্নে একজন শিক্ষাগুরু তার নিজের বাড়িতে শিক্ষার্থীদের রেখে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দিতেন। বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাবিধ প্রসারের যুগে পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ছাড়া কেবল কয়েকজন শিক্ষাগুরুর মাধ্যমে এ-কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য বিশাল আয়োজনের এত জায়গা কোথায়? বাস্তবে ক্রমে ক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা করা গেলে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর থাকার ব্যবস্থা তো তার মধ্যেই সংকুলান হবে। তাছাড়াও শিক্ষার জন্য জায়গা বেশী বরাদ্দ করলে শেষ পর্যন্ত থাকা-খাওয়া ও পরিবেশের সংকট হয় না। কারণ অশিক্ষিত মানুষের সামনে পৃথিবীময় প্রান্তর খুলে রাখলেও তারা কি ভালভাবে বাঁচতে পারবে? আর শিক্ষার উপযোগী পরিপূর্ণ পরিবেশে মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠলে ১০ জনের জায়গায় ১০০০ জনের স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নির্মাণের সামর্থ্য ও কৌশল দুটোই তাদের আয়ত্তে থাকবে। ১০০ জনের খাবার সংগ্রহের খামার থেকে ১০০০০ মানুষের খাবার উৎপন্ন করতে পারবে। পরিবেশ-সচেতনতা বৃদ্ধি পাবার কারণে পরিবেশের সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়বে। একটা সচেতন পরিবার যেমন বয়স্কদের খাওয়ার টান পরলেও ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়, তেমনি জাতিগতভাবেও আমাদের আজ ভোগ-বিলাস, অপচয় ইত্যাদি সকল দিককে সংকুচিত করে শিক্ষার আয়োজন, উৎকর্ষ ও পরিধি বাড়াতে হবে। আর মান্ধাতার আমলের পদ্ধতির মধ্যে পড়ে থাকলে চলবে না। আবার আধুনিক করার নামে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে অস্বীকার করে শিক্ষাকে বাণিজ্যিক সওদায় পরিণত করা চলবে না।

এখন প্রতি দুই শত পরিবারের জন্য অন্ততঃ ১টি প্রাথমিক স্কুল করতে হবে। কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ধারণ করতে পারার মতো জনসংখ্যা ও দূরত্বের বিবেচনায় মাধ্যমিক স্কুল কলেজ করতে হবে। উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য বর্তমান সময়ে কমপক্ষে প্রতিটি জেলায় ১টি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

আমাদের দেশে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু আছে। এটা যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাকে এমন জট-জটিলতাপূর্ণ করে রাখা হয়েছে যা ভেদ করে একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষা ও চরিত্রের বুনিয়াদি গঠন তৈরি হওয়া খুবই কঠিন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারমান এ সময়ে একজন মানুষকে যুগোপযোগী করতে হলে অন্ততঃ জীবন-জগতকে বুঝবার এবং পাল্টাবার প্রয়োজনে গতিশীল বস্তুজগত ও চলমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌল নিয়ম সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার বিকল্প নেই। এ প্রয়োজন থেকে আজকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা এমন স্তরে তোলা দরকার যাতে একজন শিক্ষার্থী অন্ততঃ জ্ঞানজগতের সকল শাখায় অবাধে বিচরণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন - ২০০৩ প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে ১১ ধরনের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ৩৭৬৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯৪২৮টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯৭১টি আন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪০৯৫টি স্যাটেলাইট স্কুল (যেখানে শুধুমাত্র ১ম ও ২য় শ্রেণী পড়ানো হয়), ৩৮৪৩টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও ৩৫৭৪টি উচ্চমাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী মাদ্রাসা (প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ ধারা থেকে যারা বহু দূরে অবস্থান করে), ৩২৬৮টি কমিউনিটি স্কুল, ২৪৭৭টি কিন্ডারগার্টেন, ১৭০টি এনজিও স্কুল, ৫৩টি পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় ইত্যাদিসহ কমিশনের হিসাব মতে দেশের মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৮,১২৬টি। এর বাইরে কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-কলেজসমূহের সঠিক সংখ্যা ও তথ্য খুঁজে পাওয়া দুরূহ।

স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকার তাদের শিক্ষানীতি এবং বক্তৃতা-বিবৃতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা জোরে-শোরে প্রচার করেছে। সর্বশেষ ১৯৯২ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার ঢাকঢোল বাজিয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ঘোষণা করে। সে সময় সরকারের ঘোষণা ছিল যে দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে ২.৫ বর্গ কিলোমিটার অন্তর অন্তর একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। অথচ ঘোষণার ১৩ বছর পরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (কমিশনের তথ্যমতে) ৩৭,৬৭১টি। অর্থাৎ এখনো দেশের ৮৮৫০০ গ্রামের মধ্যে কমপক্ষে ৫০,৮২৯টি গ্রামে কোন সরকারি প্রাথমিক স্কুল নেই।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল দশা সম্পর্কে খুব বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই। ১২ ডিসেম্বর ২০০৩, দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, ইউনিসেফের 'বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০৪' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এ দেশের ১৫ লাখ মেয়ে শিশুসহ ৩০ লাখ শিশু এখনও স্কুলের বাইরে রয়েছে।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ দৈনিক প্রথম আলোতে 'প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার নিয়ে মন্ত্রণালয়ে কারচুপি' শিরোনামে এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "২০০২ সালে বিভিন্ন সংস্থার জরিপে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার বিভিন্ন হার ঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-৪৬ শতাংশ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট-৩৭.৪ শতাংশ, গণসাক্ষরতা অভিযান-৪০ শতাংশ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-৩৩ শতাংশ।" প্রতিবেদনে বলা হয়, এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য সরকার প্রকাশ করছে না এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ঝরে পড়ার হার ৩৩ শতাংশ বলে প্রচার করা হচ্ছে, দাতাদেরও এই সংখ্যাই জানানো হচ্ছে।

৫ মে ২০০৪ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত অপর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "দেশে সাক্ষরতার প্রকৃত হার কত? সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, দাতা সংস্থা এবং এনজিওদের মধ্যে এ নিয়ে চলছে টানাপোড়েন। ... .. সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষরতার যে তথ্য প্রকাশ করেছে তা দাতাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। এনজিওরাও সরকারের দেয়া তথ্য সঠিক নয় বলে জানাচ্ছে। আবার সরকারের দুটি সংস্থা দু'রকমের হিসাব দিয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ব্যাপক গরমিল।" প্রতিবেদনে বলা হয় যে সরকারের প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি মতে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশের উপরে। আর শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট এনজিওরা দাবি করছে সাক্ষরতার হার ৪১.৫ শতাংশ। অন্যদিকে পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে সাক্ষরতার হার ৪৭.৫ শতাংশ।

এতো গেল একটি দিক। যে স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করতে যায়, সেই প্রাথমিক স্কুলগুলোর দশা কি? অধিকাংশ স্কুলে নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক ও ক্লাসরুম। স্কুলের চাল আছে তো বেড়া নেই, বেঞ্চ আছে তো টুল-টেবিল নেই। সামান্য ঝড়-বৃষ্টি-বাদলে স্কুল ছুটি দিয়ে দিতে হয়। বন্যা-ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে একবার ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুনরায় মেরামত হতে বছরের পর বছর সময় লেগে যায়। বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পাওয়ার কথা থাকলেও বহু জায়গায় সেই পাঠ্যপুস্তক পৌঁছাতে পৌঁছাতে বছরের অর্ধেক চলে যায়। এমনিভাবে সরকারি অবহেলা আর উদাসীনতায় ভঙ্গুর হয়ে চলছে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন। এর দায় বহন করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেই।

১৯ এপ্রিল ২০০৪, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে, 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণে গ্লোবাল এ্যাকশন সপ্তাহ ২০০৪ উদযাপন উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের ৮০ শতাংশ স্কুলে গেলেও এদের মধ্যে মাত্র ৬০ শতাংশ প্রাইমারী শিক্ষা সম্পন্ন করে। আর মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করে মাত্র ২ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী।

কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসমূহ

ভালো ও মানসম্মত স্কুলের অভাবে এবং ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বহু অভিভাবক এখন কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হচ্ছেন। কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং ও-লেভেল/এ-লেভেল এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধারা। কিন্ডারগার্টেনগুলোর একটি বড় অংশ দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাকাঠামোর সিলেবাস-কারিকুলাম ও পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে। কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো পুরোপুরি ইংরেজি ভাষানির্ভর। তাদের সিলেবাস-কারিকুলামও স্বাভাবিকভাবেই দেশের অপরাপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে মেলে না। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর

একেকটি একেক দেশের সিলেবাস অনুসরণ করে। ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক এদের অনুসরণ করতে দেখা যায়। আর ও-লেভেল/এ-লেভেল সম্পূর্ণ আলাদা একটি ধারা। এখানে ভাষা ইংরেজি হলেও এদের সিলেবাস-পাঠ্যপুস্তকের সাথে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মিল নেই। অধিকাংশ ও-লেভেল/এ-লেভেল পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠান সরাসরি অক্সফোর্ড প্রবর্তিত সিলেবাস অনুসরণ করে।

এ সকল প্রতিষ্ঠানে চাকচিক্যের কমতি নেই। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের বেতন-ফি লাগাম ছাড়া। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার চালচিত্র কি? দৈনিক জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার। এ সব প্রতিষ্ঠানের কোন সরকারি অনুমোদন নেই এবং নিয়ন্ত্রণও নেই। এদের কারিকুলাম-সিলেবাস, বেতন-ফি সবই নিজেদের মর্জিমাফিক নির্ধারণ করা হয়।

২৬ জুন ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, "বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক মাত্রায় ফি আদায়, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং বাংলা পুরোপুরি উপেক্ষা করা, হুবহু বিদেশী বই পড়ানোসহ নানাবিধ অভিযোগ রয়েছে। ... রাজধানীর তিনটি অভিজাত ও নামকরা স্কুল ম্যাপললীফ ইন্টারন্যাশনাল, স্কলাস্টিকা প্রাইভেট লিমিটেড এবং বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়াল (বিএইটি) সম্পর্কে অভিভাবকদের চরম ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। এই তিনটি স্কুলের অভিভাবকরা ফোরাম গঠন করে আন্দোলন করছেন, যদিও স্কুলগুলো এ ধরনের কোন ফোরামকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে কমন অভিযোগ বাণিজ্যিক মনোভাব, নানা উপায়ে অর্থ আদায়, হুটহাট বেতন বাড়োনো এবং এতসব উপায়ে টাকা নেবার পর শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত না হওয়া। স্কলাস্টিকায় পরবর্তী নির্দেশ ছাড়া বেতন না বাড়ানো এবং শিক্ষার্থীদের হয়রানি না করার জন্য আদালত অস্থায়ী নির্দেশ দিয়েছে। ম্যাপললীফ ইন্টরন্যাশনাল স্কুলের বিরুদ্ধে ১৭টি অভিযোগ তদন্ত করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়াল (বিএইটি)-এর অভিভাবকরা অযৌক্তিক বেতন-ভাতা হ্রাস, অভিভাবকদের স্কুল পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত করা, শিক্ষার মান বাড়ানোসহ বিভিন্ন দাবিতে ... সংবাদ সম্মেলন করেছে।" অন্যদিকে সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বলছে, এদেরকে আয়ের শতকরা ১০ ভাগ কর হিসাবে দিতে হবে। অর্থাৎ অসৎভাবে উপার্জিত আয়ের ভাগ সরকারকে দিলেই সব জায়েজ হয়ে যাবে।

এ সব নামীদামী স্কুলের যখন এ অবস্থা তখন অপরাপর প্রতিষ্ঠানগুলোর চিত্র সহজেই অনুমেয়। প্রায় ৯৯ ভাগ স্কুলেই মানসম্মত শিক্ষক নেই। খেলার মাঠ, লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি ইত্যাদি আয়োজন তো বলাই বাহুল্য।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯২ সালে যখন 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন' (Private University Act) সংসদে পাশ করা হয় তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হিসেবে বেশ কিছু রাশভারী কথা বলা হয়েছিল। যার প্রধান কয়েকটি ছিল ঃ- ১. উচ্চ শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ; ২. উচ্চ শিক্ষার সীমা বর্ধন; ৩. আর্থিক লাভ বা মুনাফার উদ্দেশ্যে কাজ না করা; ৪. উচ্চ কর্মদক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর এ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-এ যে চারটি মূল শর্ত ছিল সেগুলো হলো ঃ (ক) শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যসূচি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে; (খ) ন্যূনতম দুটি অনুষদ চালু করার প্রস্তুতি থাকতে হবে; (গ) মঞ্জুরি কমিশন প্রদত্ত মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, এবং (ঘ) শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা, অনুষদ ও বিভাগসমূহ স্থাপনা, শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ্যসূচি এবং কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার মান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

এই আইন প্রণীত হয়েছে ৯২ সালে এবং এর পর গত এক যুগে ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠেছে। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ কিংবা সীমা কতখানি বর্ধন করতে পেরেছে সে সম্পর্কে রায় দেয়ার জন্য খুব বেশি ভাবনা-চিন্তা করার দরকার পড়ে না যখন দেখি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনির্ভাসিটির (IUB) সমাবর্তনে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ বলেন যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর

কোনটিই '৯২-র অধ্যাদেশ মেনে চলছে না। তিনি আরও দাবি করেন যে এক যুগ পার হওয়ার পর এরা আইনে সুনির্দিষ্ট শর্তগুলো পূরণ করতে পারে নি।[৬৬]

দেশে এখন ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এর মাঝে ৪২টি ঢাকা শহরে। এবং এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০টি গড়ে ওঠেছে গত তিন বছরে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে শুরুতে যে মোহ তৈরি করা হয়েছিল ইদানীং সে মোহ খানিকটা ভাঙ্গছে। সংবাদপত্রগুলোতে অহরহ নানা প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে। বছর বছর ধরে উপাচার্য না থাকা, নিজস্ব ক্যাম্পাস ও স্থায়ী শিক্ষক না থাকাসহ আর্থিক অনিয়মের খবরও পত্রিকায় এসেছে। এই অনিয়ম এতটাই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে যে ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিকেই কমিটির সামনে হাজির হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম এবং সুযোগ-সুবিধাসহ সার্বিক অবস্থা জানাতে হবে।[৬৭]

কিন্তু এও শেষ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ২৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম খতিয়ে দেখার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৩ সালের ১৫ জুলাই মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। অক্টোবর মাস থেকে কমিটি কাজ শুরু করে। ৩ মার্চ ২০০৪, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কমিটি ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করে সীমাহীন অনিয়মের সন্ধান পায়। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এমন অভিযোগ রয়েছে যে এরা টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দাখিল করা আয়-ব্যয়ের হিসাবে ব্যাপক গড়-মিল, মিথ্যা অডিট রিপোর্ট, পরিচালনা পরিষদের বিভিন্ন পদে পরিবারের লোকজন রাখা, ইত্যাদি বহু অভিযোগ কমিটি দাখিল করেছে। একই সময়ে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত অপর এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ২৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি-ই নেই। গত ১৭ অক্টোবর ২০০৪ ঐ কমিটির রিপোর্ট পেশ হওয়ার পর দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, কমিটির মতে মাত্র ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সন্তোষজনক। যদিও স্থায়ী ক্যাম্পাস ও পর্যাপ্ত স্থায়ী শিক্ষকসহ আরও অসংখ্য শর্ত এরাও পূরণ করেনি। কমিটির সুপারিশে ৮টি প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল করার কথাও বলা হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৯২ এবং সংশোধনী '৯৮-এর ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, অনুমোদন লাভের পাঁচ বছরের মধ্যে ন্যূনতম ৫ একর পরিমাণ ভূমি ও পর্যাপ্ত অবকাঠামোর মধ্যে স্থায়ীভাবে ক্যাম্পাস স্থাপন করতে হবে। অথচ বর্তমানে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই তা নেই। প্রতিষ্ঠার পর ১০ থেকে ১২ বছর পার হয়েছে এমন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও সে শর্ত পূরণ করে নি। ২০ নং ধারায় বলা আছে যে আয়-ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুরি কমিশনের নির্ধারিত ফরমে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রত্যেক আর্থিক বছরে চান্সেলরের অনুমোদনক্রমে নিয়োগকৃত চার্টার্ড এ্যাকাউনট্যান্ট দ্বারা উক্ত হিসাব নিরীক্ষিত হবে। ৭ এর (চ) উপধারায় বলা হয়েছে, ছাত্র ভর্তির জন্য নির্ধারিত মোট আসনের শতকরা ৫ ভাগ দরিদ্র অথচ মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র ভর্তির জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং এই ছাত্রদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ থাকবে। কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা বলা দুরূহ। আর সবচেয়ে বড় যে জালিয়াতি ঘটছে তা হলো মঞ্জুরি কমিশন বা সরকারের শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ছাড়াই কতিপয় প্রতিষ্ঠান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে বসছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে!

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদান পদ্ধতির সমালোচনা করে গত ৬ জানুয়ারি ২০০৪, দৈনিক ইনকিলাবে প্রফেসর গোলাম রসূল লিখেছেন, "এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'ধরনের সেমিস্টার পদ্ধতি চালু আছে-কতকগুলোতে বছরে দুটো এবং কতকগুলোতে তিনটি সেমিস্টার। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছ'মাস করে বছরে দুটো সেমিস্টার চালু আছে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস কোন প্রকারে অনুসরণ করা সম্ভব হলেও যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে চার মাসের তিনটি সেমিস্টার পদ্ধতি রয়েছে সেখানে আদৌও সম্ভব নয়। ... যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে তিনটি সেমিস্টার চালু আছে সেখানে ব্যবসাটাই মুখ্য, মানসম্পন্ন শিক্ষাদান গৌণ। বছরে তিনবার ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ফি, কোর্স ফি ও রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় একটা দারুণ মুনাফার ব্যাপার। চার মাস সময়ের মধ্যে ১৬ দিন সাপ্তাহিক ছুটি, সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ১৫ দিন, ভর্তি পরীক্ষা, ওরিয়েন্টেশন এবং অন্যান্য ছুটি বাবদ আরো ১০ দিন সর্বমোট ৪১ দিন বাদ দিলে বাকি থাকে আড়াই মাসের কিছু বেশী। এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক

অনুমোদিত চার বছরের অনার্স কোর্স বিশদভাবে এবং কাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্নভাবে পড়ানো সম্ভব কিনা সে বিচারের ভার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। ... ছাত্র-ছাত্রীদের টাকায় এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পদের পাহাড় গড়ছে অথচ শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষার স্বার্থে বিনিয়োগ সামান্যই।"

দু'একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ এক্ষেত্রে দেয়া যায়। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এ পড়ানো হয় বিবিএ/এমবিএ, আর্কিটেকচার, ফার্মেসী, সিভিল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং। পিপলস ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় বিবিএ/এমবিএ, ইংরেজি, ফার্মেসী, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় কেবল বিবিএ/এমবিএ। স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ/এমবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয়। গ্রীন ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় বিবিএ/এমবিএ, ইংরেজি, ফার্মেসী, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং।

ঘুরে ফিরে বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এ ক'টি বিষয়ই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয়। হাতে গোনা দু' তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সবগুলোতেই বিভাগের সংখ্যা ১০-এর নিচে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি (আইউবিএটি)-তে বিভাগ ২৬টি এবং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (চট্টগ্রাম)-তে বিভাগ ২১টি। ইন্ডিপেন্ডেন্ট, গণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং দি পিপল্‌স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এ বিভাগ ১২টি করে। নর্থ সাউথ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ এবং দারুল ইহসান-এ বিভাগ সংখ্যা ৬। ইসলামী ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম এবং ইস্ট ওয়েস্ট-এ ৫টি। কুইন্স ইউনিভার্সিটিতে বিভাগ ৪টি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ৭টি এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি।[৬৮]

বহুজাতিক কোম্পানীগুলো মুক্তবাজার এবং প্রাইভেটাইজেশনের সুযোগ নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সস্তা শ্রম শোষণের স্বার্থেই একদল আইটি প্রোগ্রামার (কেরানী) কিংবা এমবিএ-বিবিএ 'হিসাব রক্ষক' বা 'ব্যবস্থাপনা কর্মচারী' তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নামক এসব কোচিং সেন্টার খোলার প্রেরণা যোগাচ্ছে। আর সরকারও মুক্তবাজারী জোয়ারে দেশের শিল্প-কৃষি ধ্বংসের পাশাপাশি শিক্ষার মৌলিক বুনিয়াদকেও একইভাবে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে। বৈষয়িক এবং ভাবগত উভয় সম্পদের দিক থেকেই এ জাতিকে পরনির্ভরশীল ও পরগাছা করে তোলা হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালে। এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বর্তমানে ১৪৮২টি। এর মধ্যে ১২৩২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ যেখানে প্রায় ১৩ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এছাড়া আইন কলেজ ৬৭টি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ৬৮টি, কম্পিউটার এবং বিবিএ ইনস্টিটিউট ৬৪টি, চারুকলা কলেজ ৬টি, সঙ্গীত কলেজ ২টি, বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ২টি, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ১০টি, শারীরিক শিক্ষা কলেজ ১৯টি, ক্রীড়াশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১টি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ১টি, প্রেস ইনস্টিটিউট ১টি, ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট ১টি এবং গার্মেন্টস এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কলেজ ১টি। আর আছে প্রতিরক্ষা বাহিনীর একাডেমী, সেনাবাহিনী স্টাফ কলেজ, অর্ডিন্যান্স সেন্টার এন্ড স্কুল, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী একাডেমী ও মেরিন ফিশারিজ একাডেমী ১টি করে।

শুরু থেকেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে ওঠা বা কাজ করার দিকে এ প্রতিষ্ঠান যায় নি। বরং এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ববিদ্যালয় অভিধায় ভূষিত না করে 'কলেজসমুহের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড' বলাই ছিল অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যদিও সেই পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের কাজটিও এরা যথাযথভাবে করতে পারছে না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার সময় এর উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছিল, কলেজসমূহের লেখাপড়ার গুণগত মান সংরক্ষণ এবং কলেজগুলোকে পর্যায়ক্রমে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং দেশের ডিগ্রি কলেজসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা। কিন্তু গত এক যুগের ইতিহাস বলছে, সে লক্ষ্য পূরণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যর্থ হয়েছে। আজ বরং অভিযোগ উঠছে যে কলেজগুলোতে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটছে। এর প্রধান কারণ, কলেজগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকা। হিসাব করে দেখা গেছে, বছরের অধিকাংশ দিনই নানা পরীক্ষার কারণে কলেজগুলো বন্ধ থাকছে, ক্লাস হচ্ছে না।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে কলেজগুলোতে ভয়াবহ রকমের শিক্ষক সংকট, ক্লাসরুম সংকট। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক কোন বিভাগে অনার্স থাকলে ৮ জন এবং মাস্টার্স থাকলে ১২ জন শিক্ষক থাকতে হবে। কিন্তু সেই বিধান অনুযায়ী দেশের কোন কলেজের কোন বিভাগেই শিক্ষক নেই। কোথাও কোথাও ১/২ জন থেকে শুরু করে গড়ে ৫/৬ জন শিক্ষক নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ৩২৭টি সরকারি কলেজের জন্য সৃষ্ট পদের সংখ্যা ১১,৭২৮। দেখা যাচ্ছে, শুধু ১০২টি সরকারি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজেই ৫০৬১টি শিক্ষক পদের ঘাটতি আছে। উচ্চমাধ্যমিক এবং ডিগ্রি বিবেচনায় নিলে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। সরকারি কলেজগুলোরই যেখানে এ অবস্থা, বেসরকারি কলেজগুলোর চিত্র কতখানি ভয়াবহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকট মোকাবেলা করতে 'গেস্ট টিচার' ভাড়া করার রেওয়াজ চালু হয়েছে। এই 'গেস্ট টিচার' ভাড়া করার জন্য ডিপার্টমেন্টগুলো ছাত্রপিছু শত শত টাকা আদায় করে থাকে।

কলেজগুলোতে ক্লাসরুমের সংকটও চরম আকার ধারণ করেছে। প্রতিটি বিভাগে গড়ে যেখানে ৬/৮টি ক্লাসরুম প্রয়োজন সেখানে ৩টি শ্রেণীকক্ষ থাকাটাও একটি বিশেষ ঘটনা! মিঞা কমিশনের প্রতিবেদনে প্রতিটি বিভাগের জন্য গড়ে ৭টি শ্রেণীকক্ষের হিসেবে জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ, বি এল কলেজ, এম এম কলেজ, এম সি কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ, বি এম কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, রাজশাহী কলেজ, এডওয়ার্ড কলেজ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, আযিযুল হক কলেজ ও সাদাত কলেজ-এই ১৩টি কলেজে ৪ শ' ১টি ক্লাসরুমের ঘাটতির কথা বলা হয়েছে। অনার্স কোর্স ৪ বছরের হওয়ার পরে এ সংকট আরও বেড়েছে, কারণ নন-মেজর বিষয়ের জন্য এখন আলাদা ক্লাসের দরকার হয়।

এ সব প্রধান সংকটের পাশাপাশি লাইব্রেরি-সেমিনার, ল্যাবরেটরি, হল-হোস্টেল, পরিবহন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা আয়োজনও কলেজগুলোতে নেই। বিভিন্ন সময় ডিগ্রি পরীক্ষার ফল প্রকাশে অনিয়ম-দুর্নীতি, ১৫/১৬ মাসেও পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে না পারা, গাজীপুরের মূল প্রশাসনিক কার্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের লাঞ্ছিত করাসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতি বহুবার আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সার্টিফিকেট ও মার্কশিট সংগ্রহ, এমনকি তথ্য সংগ্রহসহ যে কোন প্রশাসনিক কাজে সারাদেশের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুরস্থ প্রশাসনিক ভবনে ছুটে আসতে হয়। এই অপচয় ও হয়রানি বন্ধে সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাব-সেন্টার স্থাপনের দাবিও উঠেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ নেই। ফলে সবকিছু মিলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমও ভেঙে পড়েছে।

স্বতন্ত্র পরীক্ষাহল ও ক্লাসরুম নির্মাণ এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে কলেজসমূহে সারা বছর ক্লাস চালু রাখা, পরীক্ষার ৩ মাসের মধ্যে ফল প্রকাশসহ ৮ দফা দাবিতে দেশের কলেজগুলোতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ছাত্রআন্দোলন গড়ে উঠেছে। এ সকল দাবি ছাত্র-মহল ছাড়িয়ে শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-অভিভাবকদের মাঝেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আন্দোলনের মুখে সরকার দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে বাস্তবায়নের ঘোষণা দিলেও এখন পর্যন্ত তা কার্যকর করে নি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন

প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মিলেই বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটা অভিন্ন সত্তা। অনেকটা প্রাণীদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো। বিশ্ববিদ্যালয় তার স্নায়ুকেন্দ্র। কিন্তু শরীরের কোন একটি অঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হলে যেমন তা সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তেমনি শিক্ষা-প্রবাহের প্রতিটি পর্যায়ে বাধাহীন পরিবেশ না থাকলে শিক্ষার স্রোত সমাজ-মননে উর্বরতা সৃষ্টি করতে পারে না। তাই চিন্তার স্বাধীন প্রবাহ তথা মুক্তবুদ্ধির বাধাহীন চর্চা ও জ্ঞানের অব্যাহত বিকাশের স্বার্থেই সকল পর্যায়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা জরুরি।

মধ্যযুগে সামন্ত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনামলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ যাজকতন্ত্র ও শাসকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সে পরিবেশে স্বাধীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব ছিল না। নিজের গবেষণালব্ধ মত ব্যক্ত করার জন্য গ্যালিলিও'র মতো বিজ্ঞানীদের নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ফলে মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশে জ্ঞান-

বিজ্ঞান চর্চা করার স্বার্থে সেদিন প্রাতিষ্ঠানিক স্ব-শাসন বা স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠেছিল। কিন্তু আজ বুর্জোয়াশ্রেণী স্ব-শাসনের অধিকার খর্ব করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছে।

বেসরকারি স্কুল-কলেজে সরকারি অনুদান, খেয়ালখুশী মাফিক উন্নয়ন বরাদ্দ, প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতির বিশেষ অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে এবং স্কুল-কলেজের পরিচালনা কমিটির প্রধান হিসেবে সরকারি আমলাদের মনোনীত করে এবং সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে নানা অগণতান্ত্রিক বিধানের রজ্জুতে বেঁধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে অনেকটা সরকারি দফ্তরে পরিণত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষা বোর্ডসমূহের উপরও আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব আরোপ করে যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে তাদের সুবিধামত শিক্ষার সিলেবাসে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, মুক্তিযুদ্ধ এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বের জীবনী ইত্যাদি লেখা হয়। প্রতিটি সরকারের আমলেই তা দেখা যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অধিক গুরুত্বপূর্ণ

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এমন একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা বস্তুগত উৎপাদনের সর্বোচ্চ দক্ষতা সৃষ্টি করে, বিশ্বের তাবৎ ভাবসম্পদের সংযোগ সাধন, সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধন করে। উচ্চতর গবেষণা ও সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সমাজের মননশীলতার বিকাশ, উচ্চতর বিবেক ও সংস্কৃতি চেতনা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রফেসর সফিউদ্দিন জোয়ারদার এক প্রবন্ধে এটাকে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, "একটি বিশ্ববিদ্যালয় যে সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অভিসারী সেগুলি হলোঃ

ক. যুগ-সঞ্চিত জ্ঞানের রক্ষক হিসাবে কাজ করা; সাধনার মাধ্যমে, বোধের সাহায্যে সে জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে তোলা এবং বর্ধিত জ্ঞান-ভান্ডার আগামী দিনের নাগরিকদের হাতে তুলে দেওয়া।

খ. তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ মানসিকতা ও উচ্চমানসম্পন্ন মনন সৃষ্টির জন্য প্রয়াসী হওয়া।

গ. শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি দিকে নেতৃত্ব দিতে পারে।

ঘ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে তীব্র সচেতনতা গড়ে তোলা।

ঙ. বিভিন্ন বিষয়ে নিরাসক্তভাবে সত্যের সন্ধানে ব্রতী হওয়া।

চ. চিন্তা-ভাবনার স্বাধীনতার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা।

আর এ সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অভিসারী একটা বিশ্ববিদ্যালয় তখনই হতে পারে যখন বাইরের হস্তক্ষেপমুক্ত স্বাধীন পরিবেশে সে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। বাইরের শক্তি বলতে এখানে রাষ্টশক্তিসহ অন্যান্য সকল সংগঠিত শক্তিকেই বুঝানো হয়। যদিও আজ রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে মুক্ত রাখার বিষয়টি স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত আলোচনার মূল ভরকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দুনিয়ার সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাস রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের ইতিহাস। আজও রাষ্ট্রশক্তির সে আক্রমণ বন্ধ হয় নি। বরং দিন যতই যাচ্ছে তা বাড়ছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের একটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজে জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের নিরসন হয় না, সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি হয় না । কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যেখানে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষাসহ জীবনের সকল চাহিদা পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, সেখানে রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য একই বিন্দুতে মিলিত হয়। তাই রাষ্ট্রের সাথে জনগণের দ্বন্দ্বের নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে।"[৬৯]

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ইউরোপের আদলে গড়ে তোলা হলেও বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিগত প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে বিদেশি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যে কারণে ইংরেজ শাসকেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পরিপূর্ণ academic freedom কখনোই দেয় নি। তাদের সাথে অব্যাহত বিরোধ করেই বিশ্ববিদ্যালয়কে তার স্বাতন্ত্র্য যতটুকু সম্ভব রক্ষা করতে হয়েছে। এ বিষয়টি বোঝা

যায় ১৯২২ সালে ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকার কর্তৃক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তক্ষেপ করার প্রশ্নে তখনকার উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সিনেট সদস্যদের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন-তা থেকে। তিনি বলেছিলেন, "The University will not be manufactory of slaves. We want to think truely. We want to teach freedom. ... Freedom first, freedom second, freedom always ..."[৭০] (বিশ্ববিদ্যালয় দাস তৈরির কারখানা হবে না। আমরা সত্য চিন্তা করতে চাই। আমরা স্বাধীনতা শিক্ষা দিতে চাই, ... প্রথমত স্বাধীনতা, দ্বিতীয়ত স্বাধীনতা, সবসময়ই স্বাধীনতা ...।)

পাকিস্তান আমলে উপরিউক্ত পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। আইয়ুব খাঁনের শাসনামলে প্রণীত ১৯৬১ সালের কুখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের কথা সবার জানা আছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বৈরতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ঐ অধ্যাদেশে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই সেদিন পাকিস্তানী প্রায়-ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি যুক্ত হয়েছিল। সেদিন স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক অজয় রায় লিখেছেন, "... ১৯৬৮তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, স্বশাসন প্রবর্তনের আন্দোলনে, মুক্তবুদ্ধিচর্চার পরিবেশ সৃষ্টির আন্দোলনে নেমেছিলেন। ক্রমে তা দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে; আমরা নেমে এলাম পথে; শিক্ষকদের আন্দোলন মিলিত হল আরও বৃহত্তর আন্দোলনের স্রোতধারার সাথে, মূল স্রোতের সাথে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। একাত্মতা ঘোষিত হল ১১ দফা আন্দোলনের সাথে, যুক্ত হল ৬ দফার আন্দোলনে। সর্বশেষে যুক্ত হল স্বাধীনতার আন্দোলনে-মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে।

এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ও প্রগতিশীল শিক্ষক, নেতৃত্বে ছিলেন প্রবীন জ্ঞানী শিক্ষকবৃন্দ; শ্রেণীকক্ষ থেকে, গবেষণাগার থেকে, পাঠাগার থেকে বেরিয়ে এসে রাজপথে নেমে আসতে দ্বিধা করেন নি তাঁরা। ... সেই দিনের সে আন্দোলনের মূল্যায়ন করেছেন সম্প্রতি একজন বিদগ্ধ শিক্ষক অধ্যাপক আহমদ শরীফ। তাঁর মতে সেই আন্দোলন ছিল 'শিখা-গোষ্ঠীর' মুক্ত-বুদ্ধি আন্দোলনের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক, বিস্তৃত ও বিপ্লবী। এই আন্দোলনকে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'শিক্ষক-দ্রোহ' হিসেবে।"[৭১]

স্বাধীনতার পর বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়ে হলেও ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ একই সময়ে কৃষি ও প্রকৌশল-এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় নি। এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাবিদ্যালয়সমূহেও কোন প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া হয় নি। এ সকল প্রতিষ্ঠান সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এদিকে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্বায়ত্তশাসন রয়েছে বা '৭৩ সালের অধ্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, সে অধ্যাদেশেও সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়ে গেছে।

সে আইন অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত তিনজনের প্যানেল থেকে তিনি যে কোন একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন। এ পদ্ধতির কারণে, তিনজনের মধ্যে কে হবেন উপাচার্য, তার জন্য সরকারি অনুগ্রহ লাভের এক নীতিহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী ও তার সমর্থকেরা জড়িয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত যিনি নিযুক্তি পান, তাঁর পক্ষে তাই সরকারি খবরদারিও মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না। যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ অধ্যাদেশ নেই-সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই নাজুক। বর্তমানে কৃষি, প্রকৌশল ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবে একটি সরকারি দপ্তরের চাইতেও অনেক বেশি সরকারের অধীনস্ত হয়ে পড়েছে। যেমন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশে উল্লেখ রয়েছে, "The Governor of East Pakistan (President of Bangladesh) or a person designated by him shall be the Chancellor of the University."

অর্থাৎ আইয়ুব আমলের '৬১র অধ্যাদেশে বর্ণিত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের স্থানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বসিয়ে আর সবই ঠিক রাখা হয়েছে। বুয়েটের অধ্যাদেশে এমনকি 'President of Bangladesh' শব্দটিও যুক্ত করা হয় নি। '৬১-র অধ্যাদেশ মোতাবেক প্রেসিডেন্ট নিজে অথবা তার মনোনীত কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হবেন। সে সুবাদে প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রয়েছেন। ভাইস চ্যান্সেলর সিনেটের ভোটে নির্বাচিত হবেন না, চ্যান্সেলরের দ্বারা মনোনীত হবেন। চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন পদমর্যাদার যে কাউকে পদচ্যুত করতে পারেন যদি তিনি মনে করেন

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ, দায়িত্ব পালনে অক্ষম। অথবা আদালত কর্তৃক নৈতিক অপরাধে দন্ডিত। প্রথম দুইটি ক্ষেত্রে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্ত যাচাই করার বা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রোধ করার কোন ব্যবস্থা বাস্তবে থাকবে না।

সিন্ডিকেটের গঠন-কাঠামোও সম্পূর্ণ চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণাধীন। ১১ জনের সিন্ডিকেটে ভাইস চ্যান্সেলর (যিনি চ্যান্সেলর মনোনীত) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ডাইরেক্টর জেনারেল ও কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ডাইরেক্টর জেনারেল-এই দুইজন সরকারি কর্মকর্তা সদস্য, চ্যান্সেলর কর্তৃক ডীনদের মধ্যে থেকে মনোনীত দুইজন ডীন এবং ৬ জন চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত। তাহলে কি দাঁড়ালো? সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণমুক্ত কোন অবস্থান থাকলো কি? আবার একাডেমিক কাউন্সিল যেখানে সকল ফ্যাকাল্টির ডীন, সকল বিভাগের প্রধান অধ্যাপকগণ, সকল অধ্যাপক ও রীডাররা রয়েছেন, সেখানেও চ্যান্সেলরের ৫ জন মনোনীত সদস্য থাকবেন। শুধু তাই নয়, একাডেমিক কাউন্সিলের কোন সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে না যতক্ষণ সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত না হবে। আর সিন্ডিকেট তো বাস্তবে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীর আজ্ঞাবহ সংস্থা। এই ধরনের আরও বহু স্বেচ্ছাচারী বিধান বলবৎ রয়েছে। এই সবের বিরুদ্ধে, আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলনে নেমেছিলেন। '৬২-তে শরীফ কমিশনের রিপোর্টভিত্তিক শিক্ষা সংকোচন নীতি রুখতে ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বাবুল, ওয়াজীউল্লাহ'দের রক্ত ঝরেছে। অথচ স্বাধীন দেশে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোর অধিকাংশেই আইয়ুবের প্রেতাত্মা বিচরণ করছে।

আইয়ুবীয় প্রেতাত্মা কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়ে চেপে বসে তার নজির আমরা দেখেছি ২০০২ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলি থেকে। টেন্ডারবাজি নিয়ে সৃষ্ট বিরোধে সরকারি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের দুই গ্রুপের গোলাগুলিতে ৮ জুন ২০০২ প্রাণ হারায় সনি নামের একজন নিরীহ বুয়েট ছাত্রী। ঐ হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে বুয়েটের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে সরকার তৎকালীন বুয়েট ভিসিকে অপসারিত করে। এরপর সরকার ও বুয়েট প্রশাসন মরিয়া হয়ে পুলিশ দিয়ে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের দমনের চেষ্টা চালায়। এবং তাদের সর্বশেষ মহৌষধ প্রয়োগ করে, '৬১-র অধ্যাদেশ জারি করে বুয়েটে সকল প্রকার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ইংরেজ আমলের একটি অধ্যাদেশের মারফৎ একসাথে সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসি পরিবর্তন করা এবং সরকারের পছন্দ মাফিক ভিসি নিয়োগ করার ঘটনাও আমাদের অজানা নয়।

আমরা দেখেছি, কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যথার্থ অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে হলে স্বায়ত্তশাসন বা academic freedom ছাড়া তা চিন্তা করা যায় না। অথচ ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের পুনঃ পুনঃ দাবি সত্ত্বেও কৃষি, প্রকৌশল, খুলনা, শাহাজালাল এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন দেয়া হচ্ছে না। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় নি। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে বড় অংশ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজগুলো নিয়ন্ত্রণকারী 'শিক্ষা বোর্ড' জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন স্বায়ত্তশাসন নেই। সবকিছুই এখন সরকারের শক্ত নিয়ন্ত্রণে।

আজ তাই শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষা ও বিকাশের স্বার্থেই প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রকে নিতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা থাকবে জনগণের কাছে। সেজন্য আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা, কিংবা অগণতান্ত্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ বিধি বাতিল করে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা সর্বস্তরে গড়ে তুলতে হবে। স্বায়ত্তশাসনের বিধানকে জটিলতামুক্ত করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং সম্মানজনক সামাজিক অবস্থান দরকার

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। আর শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। এ কথা উচ্চস্বরে বলা হলেও বাস্তবে তার উপলব্ধি শাসকশ্রেণীর শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে কখনও প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। জ্ঞান একদিকে যেমন মানুষের জীবনসংগ্রাম থেকে আহরিত, মনুষ্যত্বের কাঠামোতে জীবন্ত এবং জীবনের সবদিককে ব্যাপ্ত করে সুশোভিত হয়; তেমনি অন্যদিকে উঁচু সাংস্কৃতিক বাহনে থাকে কার্যকর এবং সঞ্চারণশীল। সেজন্য শিক্ষক শুধু পাঠ্যবিষয় ব্যাখ্যা করে না; একটা অনাবিল আনন্দ, সীমাহীন ঔৎসুক্য, ভক্তি ও সৃষ্টিশীল সাধনার মনোভাব জাগ্রত করে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে মনে-মগজে সঞ্চারিত করেন, যা

শিক্ষার অন্তর্নিহিত শক্তি, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যকে শিক্ষার্থীর জীবনে মূর্ত করে তোলে। শিক্ষার দীপ্তি জীবনের চারদিকে ব্যাপ্ত হয়। শিক্ষকের জ্ঞানের গভীরতা ও শিক্ষাদানের কলা-কৌশল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য যদি হয় শিশুকে স্নেহ-মমতায় জড়িয়ে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করা, শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা, সমাজ ও মানব কল্যাণের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলা, অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বলিষ্ঠ মন ও সাহসী প্রত্যয় সৃষ্টি করা এবং জগতের যা কিছু বড়, যা কিছু মহৎ তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা, লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি, ইন্দ্রিয়সুখ, রিপুর তাড়না কোন কিছুর সামনেই মনুষ্যত্বকে নত না করার চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করা, তাহলে শিক্ষকদের চরিত্র ও নৈতিক শক্তি ছাড়া তা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রবিষ্ট করানো সম্ভব নয়। টেপরেকর্ডার থেকে শব্দাবলী শুনে একজন মানুষ তা কণ্ঠস্থ করতে পারে কিন্তু নিষ্প্রাণ এ যন্ত্র মানুষের মধ্যে উচ্চভাবের প্রাণশক্তি যোগাবে কি ভাবে?

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।"[৭২]

তেমনি চরিত্রের দ্বারাই চরিত্র পূর্ণতা লাভ করে। এখন একজন শিক্ষক যদি টাকার বিনিময়ে শিক্ষা বিতরণের দোকানী হন আর শিক্ষার্থীরা খদ্দের হয়ে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা কিনে আনে, তাহলে সে ছাত্রের দল কতোখানি মানুষ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরীক্ষায় হয়তো তারা এ-প্লাস ইত্যাদি গ্রেড পাবে, অনেক সার্টিফিকেট যুগিয়ে আনবে কিন্তু তাদের জীবন থেকে মনুষ্যত্বের অনেক বর্ণমালা খসে পড়বে। তারা standard of living এর কথা ভাববে, human dignity-র কথা ভাববে না। 'মানবজাতির কাছ থেকে মনুষ্যত্বের ছোঁয়ায় শিক্ষা পেয়েছি'-এই ভাবনা শিক্ষিত মানুষকে সমাজমুখী করে, সমাজের প্রতি ঋণের কথা, দায়-দায়িত্বের কথা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর 'বাপের টাকায় শিক্ষা কিনেছি'-এই মনোভাব আত্মকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ পথে মানুষকে ধাবিত করে, সমাজবিচ্ছিন্ন করে। শিক্ষার দম্ভ আর ভোগ-সুখের লালসা নিয়ে এরা সমাজ-কর্তৃত্বের যত উপরে উঠতে থাকে, মনুষ্যত্ব ও মানবতাকেও ততখানি নামাতে থাকে।

ইংরেজরা যখন শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে বিকৃতি নিয়ে এলো, তখন সেই শিক্ষায় শিক্ষিতজনদের অবস্থা দেখেই হয়তো শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "পশ্চিমের সভ্যতার একটা মূলমন্ত্র হচ্ছে standard of living বড় করা। আমাদের দেশের মূলনীতির সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করবার স্থান আমার নেই, কিন্তু ওদের সমাজ-নীতির যেমন interpretation-ই দেওয়া যাক তার আসল কথা হচ্ছে ধনী হওয়ার। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধনবিজ্ঞান-এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয়ও আছে, এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এ ধনী হওয়ার অর্থ ত কেবল সংগ্রহ করাই নয়! সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি ধনহীন করে তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য।"[৭৩]

বৃটিশ শাসন গত হওয়ার ৫০ বছর পরও শিক্ষার সে উদ্দেশ্য দূর হয় নি। এখন আমাদের এ পুঁজিবাদী দেশেও টাকা খাটিয়ে শিক্ষা কিনে অধিক টাকা উপার্জনের যে মনোভাব তা সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে সম্পদশালী হওয়ার উগ্রতাই শুধু সৃষ্টি করবে।

মানব ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নজরুল লিখেছেন, "অত্যাচারকে চোখ রাঙ্গাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি? ... দু'বেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যই যার থাকা, তার আর ধর্ম কি?

মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি? তোমার ধর্মের কথা বলবার অধিকার কি?

ওরে আমার তরুণ, ওরে আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল, তোরা আয়, তোরা ছুটে আয়-এই ভন্ডামি থেকে চলে আয়। তোরা বল্ আমাদের আগে বাঁচতে হবে। কিসের শিক্ষা? কে শেখাবে? দাস কখনও দাসকে শেখাতে পারে?"[৭৪]

আমাদের দেশে একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী যতীন সরকার যেন নজরুলের কথার প্রতিধ্বনি করেই লিখেছেন, "শিক্ষককে শুধু নির্লিপ্ত আপনভোলা ও নিষ্ক্রিয় ক্ষমাশীল তাপস হলে চলবে না, তাকে হতে হবে দুর্বাসার মতো, বিশ্বামিত্রের মতো। পুরাণোক্ত দুর্বাসা আর বিশ্বামিত্র উভয়েই তাপস ছিলেন, কিন্তু পরিপার্শ্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না, ...। মানবতাবিরোধী দানব ও অসুরশক্তির কীর্তিকলাপকে দেখেও না দেখার ভান করে আপন নাভিমূলের ধ্যানে মগ্ন

থাকতেন না তাঁরা। পরিপার্শ্বকে যারা বিরূপ করে তুলতো তাদের মুখে তাঁরা বাঞ্ছিত ক্রোধের আগুন লাগিয়ে দিতেন, পবিত্র ঘৃণার থুথু ছিটিয়ে দিতেন। পুরাণের কথা অবশ্যই কাল্পনিক এবং অনেক ক্ষেত্রে রূপক ও প্রতীক। তার কাল্পনিকতাকে ছাড়িয়ে রূপকের আবরণ উন্মোচন করলে ও প্রতীকের স্পষ্ট অর্থ চিহ্নিত করলে প্রতিভাত হবে যে, এ যুগের শিক্ষককে যদি বলি তাপস, তবে সে তাপসের নির্লিপ্তি তাঁর তপস্যার লক্ষ্যকেই বিপর্যস্ত করবে, শ্রেণীসমাজের গণবিরোধী তথা মানবতাবিরোধী এস্টাব্লিশমেন্টের স্বার্থই হাসিল করবে। তাই এরকম অবাঞ্ছিত অবস্থায় প্রতিরোধের জন্য শিক্ষককে তাঁর শিক্ষাদানের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনভাবে অবহিত হতে হবে, তাঁর শিক্ষা যেন কোন মতেই প্রতিক্রিয়াশীল সমাজবিধানকে পোক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হতে না পারে ...।" ছাত্র জনতার কাছে শিক্ষকদের অতীত ভাবমূর্তি নেমে যাওয়ার অন্যতম কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের শিক্ষকরা একান্ত খাটো হয়ে গেছেন তাঁদের ছাত্রদের কাছেই। ছাত্রদের জন্য কি ধরনের বিদ্যা হবে যথার্থ ও বৈজ্ঞানিক, পাঠ্যসূচি কিংবা পরীক্ষা-পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত, সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব কেমন ও তার পদ্ধতি কী-এ সব বিষয়ে দিক নির্দেশ দেয়ার দায়িত্ব তো আসলে শিক্ষকদের। অথচ শিক্ষকরা (অতি সামান্য ব্যতিক্রম বাদে) যেখানে এ-সব ব্যাপারে মূলত গণবিরোধী কর্তৃপক্ষেরই স্বার্থ দেখে এসেছেন, তাদেরই ছাত্ররা সেখানে শুধু নেতিবাদী প্রচারেই সোচ্চার হয় নি, যথাযথ পথের সন্ধান দিয়ে আন্দোলনেও ব্রতী হয়েছে, আন্দোলন করতে গিয়ে জীবনও উৎসর্গ করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আন্দোলনে সফলতাও ছিনিয়ে এনেছে, কর্তৃপক্ষকে নত হতে বাধ্য করেছে। এভাবেই ছাত্রদের ভূমিকার অগ্রবর্তিতা ও শিক্ষকদের পশ্চাৎমুখিতায়, শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ছাত্রদের কাছে একান্ত ম্লান হয়ে গেছে। এই ম্লানতা, বলা বাহুল্য, ছাত্ররা ঘটায় নি, আপন আচরণ দিয়ে শিক্ষকরাই নিজেদের ম্লান করেছেন। এই ম্লানতা না-ঘুচলে শিক্ষকের প্রকৃত সম্মান কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হবে না, আজকের ছাত্ররা গুরুদ্বেষী হয়ে গেছে বলে হা-হুতাশ করে কিছুই হবে না।"

তবে আদর্শ শিক্ষকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আবার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি আরো বলেন, "আঙ্গুলে গোণা যায় যাঁদের নাম, সেই পাকিস্তানী এস্টাব্লিশমেন্ট-বিরোধী শিক্ষকদের কি মুছে ফেলা যাবে ইতিহাসের পাতা থেকে? বাঙালির গৌরবময় ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের সঙ্গে থেকে কারাভোগসহ নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন যে কজন শিক্ষক, তাঁরা কি দূর ভাবীকালেও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন না? ভুলতে পারবো কি আমরা সাচ্চা শিক্ষকের প্রতিনিধি প্রথম শিক্ষক-শহীদ ডক্টর শামসুজ্জোহার নামটি? কিংবা ভুলে যাওয়া কি সম্ভব একাত্তরের একগুচ্ছ শহীদ শিক্ষকের কথা? এঁদের ভুলতে পারা যাবে না বলেই এঁদের উত্তরাধিকার বহনের দায় অস্বীকার করাও কঠিন।"[৭৫]

শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার, সম্মান প্রতিষ্ঠার বিষয়টি শুধুমাত্র শাসকদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে না। এ অধিকার অর্জনের জন্য তাঁদের সংগ্রামেও নামতে হয়। এই চেতনা জাগ্রত করতেই অধ্যাপক আলী আনোয়ার বলেন, "জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ (ইউনেস্কো) অবশ্য শিক্ষক সংস্থা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে শিক্ষকদের অবস্থান ও মর্যাদা সংক্রান্ত প্যারিসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তারা এক দীর্ঘ সুপারিশমালা রচনা করেন। এই সুপারিশমালার ষষ্ঠ প্রস্তাবে আছে যে শিক্ষকতাকে আর পাঁচটি পেশার মতোই একটি পেশা বলে ধরতে হবে। এটি এমন ধরনের একটি জনসেবামূলক পেশা যার পেছনে আছে বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান ও বিদ্যা এবং বিশিষ্ট দক্ষতা, যে জ্ঞান ও দক্ষতা দীর্ঘ আয়াসসাধ্য ও নিরবচ্ছিন্ন অভিনিবেশের ফলেই আয়ত্ত করা সম্ভব। ৮২ নং প্রস্তাবে আছে যে, শিক্ষকদের বেতনক্রম এবং চাকুরীবিধি শিক্ষক সমিতি এবং নিয়োগ কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই স্থিরিকৃত হবে। ৮৪ নং প্রস্তাবে আছে যে, শিক্ষকবৃন্দ এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে চাকুরীর শর্তাবলী এবং প্রকৃত অবস্থা সংক্রান্ত কোন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে তা নিরসনের জন্য দুই তরফের সম্মতিক্রমে যথোপযুক্ত যৌথ সংস্থা বা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও প্রর্বতন করতে হবে। যদি এই সমঝোতা ও আলোচনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত যৌথ সংস্থা বা প্রক্রিয়ার প্রয়াস নিঃশেষিত হয়ে পড়ে এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রমিক সংস্থা ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের দাবি আদায়ের জন্য যে সব পন্থা গ্রহণ করে থাকে, শিক্ষক সমিতিরও ঐ সব পন্থা গ্রহণের অধিকার থাকবে। ... কিন্তু শিক্ষকদের কাছ থেকে, কি দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে, এই সমস্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শিক্ষকদের সর্বজনীন অধিকার গোপন করা হয়ে থাকে। গোপন করার একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে শিক্ষকদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা।"[৭৬]

আমাদের দেশে শ্রমিক সংগঠনের ইতিহাস অতিশয় অর্বাচীন কিন্তু ধনিক বণিক বা ভূম্যধিকারীদের প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা ''দ্য ল্যান্ডহোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েশন'' বা "চেম্বার অব কমার্স" প্রভৃতি দেখা দিয়েছে ঊনবিংশ শতকেই। উদ্দেশ্য একই গোষ্ঠী বা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা। অথচ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৩

সালে যখন প্রথম একটি শিক্ষক সমিতি গঠনের প্রস্তাব ওঠে তখন অক্সফোর্ড ফেরত আভিজাত্যাভিমানী জনৈক অধ্যাপক মন্তব্য করেছিলেন, ''শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়ন? ছিঃ এরপর বোধ হয় ধর্মঘটেও যেতে হবে।'' বিপুল অনুপার্জিত বিত্তের অধিকারী এই ভদ্রলোকের জন্য সত্যিই যে কোন সংগঠনই নিম্নবর্গের লোকদের সঙ্গে নৈকট্যের আতঙ্ক নিয়ে আসে। নিম্নবর্গের লোকের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নটি তাঁর কাছে গৌণ হয়ে যায়। শিক্ষকদেরও তাই আত্মসচেতনতার দিন এসেছে।

যে শিক্ষক সমাজে নৈতিকতার উন্মেষ ঘটাবেন, জ্ঞানের আলো জ্বালাবেন, প্রাণী-মানুষকে সত্যিকার মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবেন, তাঁদের যদি আর্থিক দুরবস্থা, সামাজিক অনিশ্চয়তা, অধিকারহীন অসম্মানজনক জীবনযাপন করতে হয়, তাহলে তারাই বা আদর্শের প্রতীক হয়ে শিক্ষা দিবেন কিভাবে? ডঃ নুরুল ইসলাম লিখেছেন, ''একজন গ্রামীণ চৌকিদার যে দাপট নিয়ে গ্রামে জীবনযাপন করে এবং জীবনাচরণে যে স্বাচ্ছন্দ্য দেখাতে পারে গ্রামের একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক কোনও দিনই তা পারেন না।''[৭৭]

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, ''শুধু অর্থনৈতিক দিকটি বিবেচনা করলে শিক্ষকতা পেশার প্রতি যোগ্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট হবার যুক্তি পাওয়া মুশকিল। ... অন্যান্য অনেক নির্দিষ্ট আয়ের মানুষদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও প্রকৃত আয় গত ২৫ বছরে কমেছে। ১৯৭২ সালে একজন প্রভাষকের মাসিক মূল বেতন ছিল ৪৫০ টাকা । ঐ টাকায় যে দ্রব্যাদি কেনা যেত সেসব দ্রব্যাদি কেনার জন্য এখন জীবন যাত্রার ব্যয় সূচক অনুযায়ী মূল বেতন হওয়া উচিত ৮১৫০ টাকার বেশি। অর্থাৎ একজন প্রভাষক যদি এখন মূল বেতন হিসেবে ৮১৫০ টাকা পান তাহলে হিসাব অনুযায়ী ধরে নেয়া যাবে তিনি ৭২ সালের সমান প্রকৃত বেতন পাচ্ছেন। কিন্তু বর্তমানে একজন প্রভাষকের মূল বেতন ২৮৫০ টাকা অর্থাৎ সহজ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষকতার শুরুর বিন্দুতেই প্রকৃত আয় ২৫ বছরে কমে শতকরা ৩৫ ভাগের মত দাঁড়িয়েছে।''[৭৮]

ফলে শিক্ষার কাঠামোকে মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করাতে হলে প্রকৃত মানুষ গড়তে হলে শিক্ষকদের সম্মানজনক জীবনযাপনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। তাই বিজ্ঞানী-গবেষক এবং শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বেতন কাঠামোর আওতায় আনতে হবে। রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর পরেই শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধার বিধান দরকার। শিক্ষকদের যোগ্যতার বিষয়টিও নতুনভাবে ভাবতে হবে। এজন্য শিক্ষককে অবশ্যই অসাম্প্রদায়িক হতে হবে। কারণ আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষক ডঃ জোহা শহীদের মৃত্যু বরণ করে ছাত্র, যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন জাগিয়েছিলেন। আর সাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন অধ্যাপক গোলাম আজম '৭১-এর রক্তঝরা দিনগুলিতে তার অনুসারীদের স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতক বাহিনীর সদস্য রাজাকার, আল-বদর বানিয়েছিলেন। একজন শিক্ষককে অবশ্যই দেশপ্রেমিক হতে হবে। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী ভূমিকা থাকতে হবে। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার নীতি-পদ্ধতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবশ্যই পাঠদানে দক্ষতা ও শিক্ষার্থীর প্রতি ভালবাসা ও দরদী মন থাকতে হবে। শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নত করার জন্য শিক্ষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ বিষয়সমহূকে শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

পরীক্ষা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদেরই নয় গোটা শিক্ষা ব্যবস্থারও পরীক্ষা

পরীক্ষা বলতে সাধারণত বুঝায় কোন বিষয়বস্তুকে যাচাই-বাছাই করে দেখা, তার বিশ্লেষণ-মূল্যায়ন করা এবং এর যথার্থতা ও কার্যকারিতা নিরূপণ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রশ্নটিও এসেছিল ছাত্র কিংবা ছাত্রী একটা নির্দিষ্ট স্তরে দেহ-মনে সামগ্রিকতায় কতটুকু বিকশিত হয়ে উঠেছে তা পরখ করে দেখা। পাশাপাশি কতটুকু জ্ঞান সে উপলব্ধির মাধ্যমে আয়ত্ত করেছে এবং জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ ক্ষমতা কি মাত্রায় লাভ করেছে তা নিরূপণ করা এবং সে অনুযায়ী তার স্বীকৃতি দেওয়া অর্থাৎ একটা সনদপত্রের মাধ্যমে তা সার্টিফাই করা। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেও পরীক্ষা করে নেয়া। কারণ একজন ছাত্রের শিক্ষালাভ ও চরিত্রগঠন শুধুমাত্র তার একক প্রচেষ্টার ওপর গড়ে উঠতে পারে না। শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার সিলেবাস, শিক্ষকদের নৈতিকমান, শাসকশ্রেণীর কাছে শিক্ষার গুরুত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষা-কাঠামো ইত্যাদি বহু কিছু তার সাথে যুক্ত রয়েছে। ফলে একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার বিষয়টিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু হয়েছে ইংরেজ আমলে। ইংরেজ আমলে চালু হওয়া এ পদ্ধতি সম্পর্কে ড. মোকসেদুল হামিদ লিখেছিলেন, " ... ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (যা হান্টার কমিশন নামে পরিচিত) মন্তব্য করেন, 'এই ব্যবস্থা ছাত্র এবং শিক্ষকের কাজে পরীক্ষাকে প্রধান চিন্তার বিষয়ে পরিণত করেছে।' ... .. পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষণ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল না হয়ে সমস্ত শিক্ষণ পদ্ধতিই নিঃসন্দেহে পরীক্ষা-নির্ভর হয়ে পড়েছে। ... পদ্ধতিটির পরিবর্তন বা সংশোধন না করে ছাত্রদের উপর পরীক্ষার বোঝা বাড়িয়ে শিক্ষা সংকোচনের নীতিকে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার অব্যাহত রেখেছিল।"[৭৯]

এই অবস্থার আজ অবধি কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং বর্তমানে আমাদের দেশে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ফেল করার পরও শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়ে না। শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে সমাজে তোলপাড় হয় না। বরং শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পাশের হার কম হওয়ার জন্য কৃতিত্ব দাবি করা হয়, বলা হয় এ নাকি শিক্ষার মান বাড়ার ফল। এর কারণ শাসকশ্রেণী পরীক্ষাকে উচ্চশিক্ষা সংকুচিত করার একটা হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছে এবং ব্যর্থতার সকল দায়-দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। একজন ছাত্রও যদি ফেল করে, তাহলেও তা নিয়ে ভাবনা করতে হবে, একে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। কেন সে অকৃতকার্য হলো? কোথায় গলদ ছিল?-তা বের করতে হবে। আর অসংখ্য শিক্ষার্থী যেখানে ফেল করছে সেখানে বাস্তবে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা (failure)-ই মূলত প্রমাণিত ধরতে হবে।

১৯৮১-৮২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ফেলের হার ছিল শতকরা ৪১.১৫ ভাগ। ১৯৯৯ সালে সে হার হয়েছে শতকরা ৪৬ ভাগ। আর ২০০১ সালে ৬৪.৭৮%, '০২ সালে ৫৯.৩৪%, '০৩ সালে ৬৪.৮১% এবং ২০০৪ সালে এসে সে হার দাঁড়িয়েছে ৫১.৯৭%।

১৯৮১-৮২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ফেলের হার ছিল শতকরা ৭২ ভাগ। ২০০১ সালে ৭১.৫৯%, '০২ সালে ৭৩.৭৪%, '০৩ সালে ফেলের হার দাঁড়িয়েছে ৬৪.১২% এবং '০৪ সালে এই হার ৫২.২৬%। কি অস্বাভাবিক এবং গ্লানিকর বিষয়! এত বড় ব্যর্থতাকে মূলধন করে এবং তা মেনে নিয়েই আমরা সফলতার স্বপ্ন দেখছি।

শিক্ষার বিষয়বস্তু যদি সমাজের বৈপ্লবিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে যদি সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, উন্নত চরিত্র ও বিবেক গড়ার বিষয় সম্পৃক্ত না থাকে তা হলে শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ কমে যায় অথবা ক্যারিয়ার তৈরির যান্ত্রিক ঝোঁকে মুখস্থবিদ্যার পারদর্শিতা দেখানোর প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া অংশের মধ্যে পরীক্ষার হলে নকলের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হবার প্রবণতা দেখা যায়। মুখস্থবিদ্যাও যে নকলের তুলনায় কোন অংশে কম নয় এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ বক্তব্যটা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায়, সেই বা কম কি করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব, যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই।"[৮০]

আমাদের দেশে শিক্ষাকে উপলব্ধি না করে পাস করার প্রবণতা যেমন বাড়ছে, তেমনি পরীক্ষার হলে নকল করে পাস করার প্রবণতাও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শোষণ ও বৈষম্যের সমাজের সামাজিক অবক্ষয়ের প্রভাব এই প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। একই পরিবেশে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করতে পারছে কি না, শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যার্থীর মনে ঔৎসুক্য, কৌতুহল ও সৃজনী মনোভাব শিক্ষকেরা তৈরি করতে পারছেন কি না, শিখিয়ে দেওয়া নয়, শিখতে পারার ক্ষমতা ছাত্ররা অর্জন করছে কি না, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন বিদ্যালাভের সহায়ক কি না-এ সকল বিষয় বিবেচনার বাইরে রাখলে পরীক্ষাপদ্ধতি গুদামের স্থান সংকুলান অনুযায়ী পণ্য বোঝাই করা কিংবা বাসে-ট্রেনের আসন সংখ্যা অনুযায়ী যাত্রী বোঝাই করার সামিল হয়ে পড়বে। আর এ অবস্থায় নকল প্রবণতা বাড়তেই থাকবে।

সমাজের সকল ক্ষেত্র থেকে বৈষম্য দূর, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উঁচু সাংস্কৃতিক আধারে সমাজ মনন গড়ে তুলতে না পারলে শুধু শাস্তি দিয়ে কিংবা শাস্তির ভয় দেখিয়ে অপরাধ প্রবণতা দূর করা যায় না। তেমনি শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক সংস্কার ও মানোন্নয়ন ছাড়া বহিষ্কার-তিরষ্কার দিয়ে নকল প্রবণতাও দূর করা

যাবে না। প্রতি বছর তাই বহিষ্কারের সংখ্যা এবং সকল প্রবণতা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সমান তালে। আমরা তাই মনে করি পরীক্ষা-পদ্ধতির একটা আমূল পরিবর্তন দরকার।

যেমন ধরা যাক, ৬ মাস ধরে যে বিষয়বস্তু পড়ানো হয়েছে সে বিষয়ের উপর টানা ৫ থেকে ৭ দিন ক্লাসের সকল শিক্ষক ও ছাত্র উপস্থিত থেকে সরাসরি প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে যথাক্রমে A, B, C-এই তিন গ্রেডে শিক্ষকমন্ডলীর সর্বসম্মত কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মান নির্ণয় হতে পারে। আবার শিক্ষকের মান নির্ণয়ও ছাত্রদের দ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে ছাত্রদের মতামত প্রতিবছর কমপক্ষে একবার বিবেচনার জন্য নেয়া দরকার। এতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও বৃদ্ধি পাবে। যে শিক্ষকেরা বিগত দিনে পড়িয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীদের মান সম্পর্কে তাদের একটা সাধারণ ধারণা তো আছেই। তারপরেও সরাসরি আদান-প্রদান (lnteraction - discourse) প্রক্রিয়ায় বুঝা সহজ হয় শিক্ষার্থী কতোটা বুঝতে বা শিখতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে আশেপাশের স্কুলের শিক্ষকরাও উপস্থিত থেকে সহায়তা করতে পারেন এবং নিজেদের শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণ-মানের দিক থেকে উৎকর্ষতা লাভ করতে পারেন। এ প্রক্রিয়ায় মুখস্থ করার চেয়ে আত্মস্থ করার বিষয় প্রাধান্য পায়। এভাবে ছাত্ররা প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠতে পারে। শতকরা ৮০ ভাগ নম্বর এ প্রক্রিয়ায় দিয়ে বাকি ২০ ভাগ লিখিত প্রশ্নের উত্তরের জন্য রাখতে হবে। নইলে লেখার ক্ষমতা সৃষ্টি হবে না। তবে প্রশ্নপত্র এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে না বুঝলে বই দেখেও একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ উত্তর দিতে পারবে না। এখানেও আত্মস্থ করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর যারা শিক্ষা গ্রহণে পিছিয়ে পড়ছে বা সামগ্রিকভাবে তাল মিলিয়ে এগুতে পারছে না তাদের বিষয়ে বিশেষভাবে যত্ন নিতে হবে। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নেয়ার জন্য বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটা টিম গঠন করে সাধারণ পাঠদানের পাশাপাশি বিশেষভাবে এদের প্রতি যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পিছিয়ে পড়া ছেলে-মেয়েদের জন্য বিশেষ ক্লাশ নিতে হবে। পয়সার বিনিময়ে প্রাইভেট পড়ানোর পদ্ধতি কোনক্রমেই অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না। এ সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে কেবল ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে গ্রেডিং চালু করার মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না।

সিলেবাস

শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিক্ষার সাফল্যের জন্য খুবই জরুরি। এই বিষয়বস্তুর একটি হলো মৌলিক দিক; যেমন-ভাষাশিক্ষা, সঙ্গীত, চিত্রকলা, খেলাধুলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, জীববিদ্যা, দর্শন, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি। অন্যদিকে এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে এসবের পরিপূরক প্রযুক্তিবিদ্যাসহ মৌলিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাসমূহ।

বিষয়বস্তুকে শিক্ষার স্তরবিন্যাস অনুযায়ী ঢেলে সাজানো এবং ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধরূপে উপস্থাপন করা, যা শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট এবং উৎসাহী করে তুলতে পারে-কাজটি খুবই জটিল ও দুরূহ। এর জন্য গবেষণা দরকার। কারণ বস্তুজগত এবং সমাজজীবন গতিশীল এবং চলমান। মানুষের ধারণা ও বোধশক্তিও তাই ক্রমবিকাশমান ও পরিবর্তনশীল। একই বিষয় সম্পর্কে ধারণাও সকল সময় একরকম থাকে না। অতীতে সত্য ধারণা বলতে একদিন মানুষ যা বুঝতো আজ তা মিথ্যা হয়ে যায় না; কিন্তু অসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে বাধ্য। তাকে সম্পূর্ণ করে দিয়েই আবার সত্য নতুনরূপে সজীব হয়, অমোঘ কার্যকারিতা নিয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। এই নতুন সত্যোপলব্ধিকে কারো মনগড়া বা খেয়াল-খুশির উপর দাঁড় করাতে চাইলেই তা সত্য হয় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারধারা ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে ফেলেই তাকে ক্রমাগত অধিক কার্যকর ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। এই কাজটা ঠিক ঠিক মতো করতে না পারলে শিক্ষার সত্য বিষয়ও দুর্বোধ্য এবং একঘেয়ে হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীর জানার আগ্রহে ভাটা পড়ে।

আবার শিক্ষার বিষয়বস্তু যাই হোক তাকে পরিবেশন করার মাত্রা এবং কলাকৌশলও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম শ্রেণীর একটি শিশুকেও নিউটনের গতিতত্ত্ব এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব খেলার সামগ্রী দিয়ে, অবস্থানের তারতম্য দিয়ে, কথোপকথনের ভঙ্গিতে শিক্ষা দেয়া যায়। ভূতের গল্প বলা যতো সহজ, এই কাজটা ততো সহজ নয়। সেজন্য শিক্ষার বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর বয়স, মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক-সম্বন্ধের ধরন ও নির্দিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় রেখে ঠিক করতে হবে।

শিক্ষার সিলেবাস তৈরি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক স্কুল-কলেজ, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষাবিদ ও সকল স্তরের ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে আলোচনা সাপেক্ষে সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি গঠন করতে হবে। তারা শিক্ষা সিলেবাসের যে খসড়া তৈরি করবেন তা নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা করে প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে কার্যকর হতে পারে। সিলেবাস সংক্রান্ত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য থানা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন করতে হবে।

শিক্ষা কাঠামোর স্তরবিন্যাস

শিক্ষার স্তরবিন্যাস যদি বাস্তবানুগ না হয় তাহলে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। শিশু, কিশোর, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী স্বচ্ছন্দ পরিবেশে, আনন্দের সাথে, আলো-বাতাসের মতো শিক্ষাকে ধারণ করতে করতে এগুবে। একদিকে দেহের সুঠাম গঠন, অন্যদিকে মনের বিস্তার ঘটবে। সেজন্য কয়েকটি স্তরে এই শিক্ষাদান পদ্ধতি সমাপ্ত হতে পারে ঃ-

১. প্রি-প্রাইমারী : ২ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের খেলাধুলা, আনন্দময় সংগ, পুষ্টিকর খাবার, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদির মধ্যে রেখে শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন অথবা আলাদা নার্সারী বা প্রি-প্রাইমারী যত্নকেন্দ্র করা যায়।

২. প্রাইমারী : ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এই শিক্ষা থাকবে।

৩. মাধ্যমিক : ৮ম শ্রেণী থেকে স্নাতক বা চতুর্দশ ক্লাস পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর করা যায়।

৪. উচ্চশিক্ষা : স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাকে উচ্চ পর্যায় ধরা যাবে। এই শিক্ষা হবে বিশেষায়িত (Specialized)। এর মেয়াদ বিভিন্ন হতে পারে, উচ্চশিক্ষার এই স্তরে তা নির্ভর করবে কতোটা প্রায়োগিক কিংবা গবেষণাধর্মী তার উপর।

নারীশিক্ষা

নারী পুরুষ মিলেই মানুষের সমাজ। সেজন্য সভ্যতাকে আমরা নারী সভ্যতা কিংবা পুরুষ সভ্যতা বলি না, মানব সভ্যতা বলি। তাই নর-নারীর সমতালে, সমান গতিতে এগুনো ছাড়া সভ্যতার বিকাশ সম্ভব নয়। শিক্ষা মানুষের মানবিক অস্তিত্ব বিকশিত করে। মানবিক মূল্যবোধসমূহ জাগ্রত করে। সমাজ অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল নিয়মগুলোকে আয়ত্ত করতে সহায়তা করে। বেগম রোকেয়া বলেছেন, "... আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে-একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।"[৮১]

নারী পুরুষের শিক্ষা ও অধিকারের বৈষম্য আজ পুরুষশাসিত ধনবাদী সমাজে বহু বিকৃতির জন্ম দিচ্ছে। নারীকে সমমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের অধিকার থেকে সরিয়ে ভোগ্যপণ্যরাজির কাতারভুক্ত করা হয়েছে। সামন্ত ভোগ-মানসিকতা ও পুঁজিবাদী পণ্য-মানসিকতা এ দুই আবর্তে পড়ে নারী প্রতিনিয়ত অসম্মানিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে। বহুকাল ধরে শোষণমূলক পুরুষশাসিত সমাজে অধিকারহারা নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, ''... বহুকাল হইতে নারীহৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই-এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না!"[৮২] শিক্ষা-দীক্ষায় নারী-পুরুষের অসমতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন! স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমন্ডলের ঘনফল তুলাদন্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতির্বেত্তা মহাশয়, আপনার পার্শ্বে আপনার সহধর্মিনী কই?"[৮৩]

মুসলমানদের মধ্যে নারী-শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে । আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়।"[৮৪] "... ৬০/৭০ বৎসর পূর্বে পুরুষের পক্ষেও ইংরাজী শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। ইংরাজী পড়িলেই লোকে কাফের হইত। এখন কর্তারা তাহার ফলভোগ করিতেছেন।"[৮৫]

আমাদের সমাজে নারীরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে নানা শাখায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকৃত মানুষের মর্যাদা নিয়ে পুরুষের পাশাপাশি সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখবে-বেশিরভাগ মানুষই এটা ভাবতে অভ্যস্ত নয়। নারীকে পরিবারেও বোঝা হিসেবে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। এজন্য পরিবারগুলোতে মেয়েদের শিক্ষিত করার চাইতে দ্রুত পাত্রস্থ করে ঝামেলামুক্ত হওয়ার প্রবণতা থাকে বেশি। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া বলেন, "... ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।"[৮৬]

"... স্বামীর 'ঘর করাই' নারী-জীবনের সার নহে। মানব-জীবন খোদাতালার অতি মূল্যবান দান,-তাহা শুধু 'রাঁধা উনুনে ফুঁ-পাড়া আর কাঁদার' জন্য অপব্যয় করিবার জিনিষ নহে! সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধঘোষণা করিতেই হইবে!"[৮৭]

নারীরা আজকে শিক্ষা-দীক্ষা এবং আর্থিক-সামাজিক অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও সমাজ-সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা কোন কালেই কম ছিল না। নারী-পুরুষের সহ-অবস্থানকারী এই সমাজে নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার অর্থই হচ্ছে সমাজকে এক ভারসাম্যহীনতার দিকে ঠেলে দেয়া, যে ভারসাম্যহীনতা একদিকে সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতাকে বাধাগ্রস্ত করে আর অন্যদিকে নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যেও নিয়ে আসে বহুমাত্রিক জটিলতা। কেননা শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকা একদল মানুষের সাথে, শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন একদল মানুষের সম্পর্ক কখনই উন্নত রুচিবোধ, সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধের জন্ম দিতে পারে না; বরং এগিয়ে থাকা অংশটি যে কোন মুহূর্তে পশ্চাৎপদ মানসিকতার শিকার হতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে নজরুল বলেছেন,

"নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে!
যুগের ধর্ম এই-
পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই!
শোনো মর্ত্যের জীব!
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব!"[৮৮]

ফলে সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতি ও মানবিক মর্যাদা ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য নারীদের শিক্ষা-কাঠামোয় নিয়ে আসা এবং ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নারীদের আজকে পুরুষের সাথে সমতা বিধান এবং অগ্রগতির জন্য শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কর্মক্ষম মানুষ হিসেবে নারীদের গড়ে তোলার সকল আয়োজন শিক্ষা-কাঠামোয় করতে হবে। এবং নারীদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে উঠার প্রয়োজনে ২৫ বছর বিয়ের বয়স ভেবে দেখা যেতে পারে। এছাড়া সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা চালু রাখতে হবে। বুর্জোয়ারা একদিন ঘরের বন্দিদশা থেকে নারীদের মুক্ত করে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উৎপাদন কর্মকান্ডে-সর্বত্র পুরুষের সমমর্যাদা ও সমদক্ষতার স্তরে তোলার কথা বলেছিল। আজ তারা নারীদের ঘর থেকে বের করে বাজারী পণ্যে পরিণত করছে। বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বিশ্ব বিজ্ঞানী, বিশ্ব সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা হচ্ছে না। এদের নজীর দেখিয়ে, অন্যদিকে, ধর্মীয় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি নারীদের অন্তঃপুরে বন্দী রাখার যুক্তি খাড়া করছে। ফতোয়াবাজদের হাতে অসংখ্য নারীকে প্রাণ হারাতে হচ্ছে। তাই সমাজ-সভ্যতা বিকাশের স্বার্থেই নারীশিক্ষা প্রসারের দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আজকে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজ বদলের সংগ্রামে সামিল হতে হবে। নারী শিক্ষা প্রসারের উপযোগী সামাজিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ধর্মান্ধ-কূপমন্ডূক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে আদর্শ চেতনা বিকাশের পরিপূরক সিলেবাস শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা

প্রতিবন্ধী মানুষ মাত্রই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, উৎকর্ষে সমাজের পশ্চাদদশা এবং সভ্যতার অপূর্ণতাকে তুলে ধরে। এরা ক্ষেত্র বিশেষে তাদের পূর্বসূরিদের অজ্ঞতা, অসংযম এবং দায়িত্বহীনতার নির্দোষ ফসল। সেজন্য কোন একটি বিশেষ পরিবারে জন্ম নিয়েও এরা গোটা সমাজকে দায়বদ্ধ করে রাখে। তাই দৃষ্টিহীন, কালা-বোবা, পঙ্গু বা মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করা মানে সামাজিক-মানবিক মূল্যবোধকে রক্ষা করা। এই শিশুদের জন্য প্রত্যেক জেলায় রাষ্ট্রীয় খরচে আবাসিক সুবিধাসহ পরিপূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য যে ধরনের প্রশিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ, সাজ-সরঞ্জামাদি দরকার তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যে কোন একটি বা দুটি সাধারণ বিদ্যালয়ের সাথে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের সঠিক পরিচর্যা এবং বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয় আয়োজন অত্যন্ত অপ্রতুল। এমনকি এদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণের জন্য কোন শুমারী এখন পর্যন্ত করা হয় নি। যদিও বাংলাদেশ ১৯৯৩ সালে 'প্রতিবন্ধী সমঅধিকার সনদ'-এ স্বাক্ষর করেছে, ১৯৯২ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত পালিত হয়েছে 'প্রতিবন্ধী দশক'। ২০০৩ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রতিবন্ধী মিলেনিয়াম পালনের ঘোষণাও রয়েছে। এছাড়া আছে 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন - ২০০১'।

ধারণা করা হয়, সারাদেশে প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রবণ-প্রতিবন্ধী আছে। বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, বধিরদের জন্য সারাদেশে সরকারি স্কুল ৫ বিভাগে মাত্র ৫টি। এর সবগুলোতেই ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। সংস্থার পরিচালনায় সারাদেশে ৯টি স্কুল এবং ১৬টি ক্লাব আছে। এগুলোতে সর্বমোট শিক্ষার্থী ৬ শতাধিক, শিক্ষক মাত্র ৭০ জন। একমাত্র ঢাকার বিজয়নগরস্থ স্কুলে এসএসসি পর্যন্ত পড়ানো হয়। এখানে শিক্ষার্থী ২৭৫ জন এবং শিক্ষক ২০ জন। বগুড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থিত স্কুলে পড়ানো হয় ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত, বাকিগুলোতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত। সংস্থার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন অর্থ সহায়তা দেয়া হয় না। এ সকল প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, ভাষাগত সমস্যা ও সুযোগ-সুবিধার অভাবে শিক্ষকরা বেশি দিন টেকে না।

'বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস' উপলক্ষ্যে ১৫ অক্টোবর ২০০৪ দৈনিক প্রথম আলো-তে মোঃ সারোয়ার হোসেন খান লিখেছেন, "দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যথেষ্ট শৈথিল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করেও ভবিষ্যতে পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তারা আজ দারুণভাবে হতাশাগ্রস্ত।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, "৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে। তার মধ্যে ৪৭টি রাজস্ব খাতে এবং বাকি ১৭টি উন্নয়ন খাতে পরিচালিত হচ্ছে। এই স্কুলগুলো পরিচালিত হচ্ছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক। পরিচালনায় রয়েছে যথেষ্ট অযত্ন ও অব্যবস্থাপনা। ওই সব স্কুলে যেসব রিসোর্স শিক্ষক রয়েছেন তাদের বেতন ১৫ অক্টোবর ২০০৩ থেকে এ পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে। আর রাজস্ব খাতে যে স্কুলগুলো পরিচালিত হচ্ছে তার প্রায়গুলোতেই আজ পর্যন্ত ছাত্রাবাস নির্মিত হয়নি। এখন পর্যন্ত শূন্য রয়ে গেছে বেশ কয়েকটি রিসোর্স শিক্ষকের পদ। এ স্কুলগুলোতে যেসব দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়ে থাকে তাদের অনেকের ব্রেইল পদ্ধতি জানা নেই। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে যেসব বইপত্র সরবরাহ করা হয় তা আগের ছাপানো, যা বর্তমান সিলেবাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।"

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য সারাদেশে মাত্র ৫টি সরকারি প্রাথমিক অন্ধ বিদ্যালয় রয়েছে। প্রতিবছর গড়ে মাত্র ২০ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এসএসসি পরীক্ষায় পাস করার সুযোগ পায়। এইচএসসি পরীক্ষায় এ সংখ্যা ১০/১৫ জন, কোন কোন বছর আরও কমে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা।

শ্রবণ-প্রতিবন্ধী ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের বাইরেও আছে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। এদের জন্যও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা নামমাত্র। ফলে সকল প্রতিবন্ধীকে দ্রুত সামাজিক পরিচর্যা ও শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষানীতিতে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের শিক্ষা

আমাদের দেশে সরকারি হিসাবমতে প্রায় ২৯টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে এরা প্রায় ৪০ লক্ষাধিক। এরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার। শিক্ষাক্ষেত্রেও তারা বহুদূর পিছিয়ে রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৩টি ক্ষুদ্রজাতিসত্তা বসবাস করলেও এখানে সবগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা। এই এলাকায় প্রথম স্কুল চন্দ্রঘোনা বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬২ সালে। শুরুর কয়েক বছর পর্যন্ত এখানে বাংলা ও ইংরেজীর পাশাপাশি চাকমা ও মারমা ভাষায় শিক্ষাদান করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে চাকমা ও মারমা ভাষা শিক্ষাদান সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এখানে দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষাই শিক্ষার প্রধান মাধ্যম। দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে পড়ানো হয় ইংরেজী, কিন্তু মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এ জনগোষ্ঠীর জন্য রাখা হয় নি।

রাঙামাটি শহরের সদর উপজেলায় ৫২টি সরকারি প্রাইমারী স্কুলের মধ্যে ১৬টি শহর কেন্দ্রের পৌর এলাকায় ও বাকী ৩৬টি পৌর এলাকার বাইরে অবস্থিত। জানা গেছে, পৌর এলাকার বাইরের স্কুলগুলোতে শিক্ষক সংকট প্রবল। ৮টি স্কুলে শিক্ষক আছে মাত্র ১ জন করে, ১৮টিতে শিক্ষক আছে মাত্র ২ জন করে। শিক্ষকদের মানও এখানে সন্তোষজনক নয়। অনেক স্কুল খোলা হয় সপ্তাহে মাত্র ২/৩ দিন। বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার স্কুলগুলোরও অবস্থাও একই রকম। পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বেসরকারি স্কুলগুলোতেও শিক্ষক সংকট বিদ্যমান। একদিকে শিক্ষক স্বল্পতা, অন্যদিকে বেতন বৈষম্যের শিকার এ সকল শিক্ষকরা জীবিকার জন্য বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে শিক্ষকতার কাজে সময় দিতে পারেন খুব সামান্যই। ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য-সহায়তায় পরিচালিত প্রাইমারী স্কুলগুলো রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের স্কুল রাঙামাটিতে ২৮টি, খাগড়াছড়িতে ২২টি কিন্তু বান্দরবানে একটিও নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম চাষের সময় ও সাধারণ সময়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিক্ষাদান করার জন্য স্যাটেলাইট স্কুলের নাম ও কমিটি তালিকাভুক্ত থাকলেও এদের অধিকাংশেরই কার্যকারিতা নেই।

গোটা পার্বত্য অঞ্চলের অনেক জায়গায় স্কুল নেই, অথচ কাগজে কলমে দেখানো হয়েছে যে সেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। বেশিরভাগ স্কুলেই ১ জন বা ২ জনের অধিক শিক্ষকই নেই। মাত্র ১ জন শিক্ষক নিয়ে শিক্ষাকার্যক্রম চলছে এমন স্কুলের সংখ্যা অগণিত। প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিকাংশ স্কুলই সপ্তাহে মাত্র তিন দিন খোলা থাকে। আবার রমজান মাসে এ সকল স্কুল বন্ধ রাখার ফলে তাদের শিক্ষাজীবন থেকে একটি মাস হারিয়ে যায়, অথচ বিজু উৎসব যা এই ক্ষুদ্রজাতিসত্তাগুলোর প্রধান উৎসব সে সময় কোন ছুটি নেই।[৮৯]

পার্বত্য অঞ্চলের বাইরেও সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নওগাঁসহ সমতল ভূমিতে ১৬টি ক্ষুদ্রজাতিসত্তার অধিবাসীরা বসবাস করে। এছাড়াও আছে উর্দুভাষী বিহারী জনগোষ্ঠী। এদের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার আয়োজনের চিত্রও পার্বত্য এলাকার অনুরূপ।

এদের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের দিকে খেয়াল রেখে এদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার আয়োজন রাখা দরকার-যাতে তারা নিজস্ব স্বকীয় ধারায় বেড়ে উঠে জাতীয় মূলধারার সঙ্গে মিশতে পারে।

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবনচিত্র ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায় না। এদের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ইত্যাদির দিকে খেয়াল রেখে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে। এই জাতিসত্তাগুলো থেকে আগত শিক্ষিত মানুষদের মধ্য থেকে যথাসম্ভব শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আদিবাসী বসতপূর্ণ এলাকায় বিশেষ ধরনের স্কুল ও ভাষা-সংস্কৃতি-শিক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের স্বতন্ত্র বিকাশের উপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে।

শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বৃটিশ-পাকিস্তানী ও স্বাধীনদেশের শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন

শিক্ষার নীতিগত প্রশ্নে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক, পাকিস্তানী প্রায়-ঔপনিবেশিক শাসক এবং স্বাধীন দেশের বুর্জোয়া শাসকদের মধ্যে সময়, পরিস্থিতি এবং মাত্রাগত কিছু তারতম্য ছাড়া মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোন পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। একটা সুরের ঐক্য তাদের সকলের মধ্যে রয়েছে; তা হলো, যে শোষণ ও বৈষম্যের সমাজ তারা টিকিয়ে রেখেছে-এর প্রয়োজনের বাইরে তারা শিক্ষাকে গণ-মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দেবে না। ফলে জনগণের

অধিকারের প্রশ্নে-সমাজ প্রগতির অর্থে শিক্ষার প্রয়োজন তাদের কাছে বাহুল্য এবং দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, একটা রাষ্ট্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এবং শাসকশ্রেণীর শ্রেণী-চরিত্রের ওপর নির্ভর করে শিক্ষানীতি কি ধরনের হবে। শিক্ষানীতির ভূমিকায় এবং প্রস্তাবনায় চমৎকার-চটকদারী বক্তব্য যাই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা শিক্ষা সংকোচনের নীল নক্সায় পরিণত হয়। বৃটিশ আমল থেকেই তা হয়ে এসেছে।

১৭৯২ সালের চার্লস গ্র্যান্টের শিক্ষাবিষয়ক সুপারিশ মালা, ১৮৩৫ সালে মেকলের শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন, ১৮৩৮ সালের উইলিয়াম এ্যাডামসের শিক্ষা বিষয়ক জরীপ, ১৮৫৪ সালে উড-এর ডেসপাচ, ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারের শিক্ষা কমিশন, ১৮৯০ সালে লর্ড কার্জনের শিক্ষা সুপারিশ, ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন, ১৯২৯ সালে হার্টিস কমিশন, ১৯৩৪ সালে সাপ্রু কমিশন, ১৯৪৪ সালে অ্যাকেট কমিশন-এদের সকলের মর্মার্থ ফুটে উঠেছিলো মেকলের শিক্ষানীতির মধ্যে। তিনি বলেছিলেন, "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, lndian in blood and colour, but English on taste, in opinion, in morals and in intelect." (আমরা বর্তমানে সচেষ্ট হবো এমন একটি শ্রেণী তৈরি করতে যারা আমাদের এবং যে লক্ষ কোটি মানুষকে আমরা শাসন করছি তাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারি হিসেবে কাজ করবে; তারা হবে এমন একটি শ্রেণী, যারা রক্ত-বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি-চিন্তা-নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ।) অর্থাৎ একটি মধ্যস্থতাকারি শ্রেণী বা দালাল গড়ে তোলাই হবে নেটিভদের জন্য ইংরেজদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। এর আগে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মকর্তা বলেছিল, আমেরিকায় ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে আমরা ভুল করেছিলাম, ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমেরিকা আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে-ফলে ভারতবর্ষে আমরা সে ভুল করতে পারি না। চার্লস উডও ১৮৫৪ সালে তার সরকারের কাছে পাঠানো রিপোর্টে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ থেকে কাঁচামাল ইংল্যান্ডে সরবরাহ করা এবং সে দেশে উৎপন্ন শিল্পজাত পণ্য ভারতবর্ষে বিক্রি ও বাজারজাত করার উদ্দেশ্যেই শিক্ষানীতি চালু করা হচ্ছে।

ফলে ইংরেজরা এদেশে যতটুকু শিক্ষা বিস্তার করেছিলো তা এদেশের মানুষকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-ইতিহাসে-দর্শনে নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ আধুনিক গণতান্ত্রিক মানুষ হিসেবে বিকশিত করার জন্য যে নয়; বরং তাদের শাসন-শোষণ স্থায়ী এবং নিরাপদ করার জন্য, এ কথা সংখ্যাতত্ত্বের ভিড় হাজির করে, অভিলাষী বচন-বাচনে, সাফল্যের খন্ডিত চিত্র তুলে ধরে এবং মূল জায়গা থেকে দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সেদিন শাসকেরাও গোপন করতে চেয়েছিল।

বৃটিশ রাজ একদিকে শোষণ করবে, অন্যদিকে জনগণকে সত্যিকার জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বিকশিত করবে-এটা যে অসম্ভব সে বিষয়ে স্পষ্ট করে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্বনাশের জন্যই তৈরি করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকিল, মোক্তার, মুন্সেফ, হুকুম মত জেলে দিতে ডেপুটি, সব্‌ডেপুটি, ধরে আনতে থানায় ছোট-বড় পিয়াদা, ইস্কুলে ডুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মাষ্টার, কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্বরতার লেকচার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, আফিসে খাতা লিখতে জীর্ণ-শীর্ণ কেরানি,-তার শিক্ষাবিধান এর বেশি দিতে পারে এও যে আশা করতে পারে, সে যে পারে না কি আমি তাই শুধু ভাবি।"[৯০]

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও শিক্ষা বিষয়ে শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটে নি। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করাচীতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে 'পাকিস্তান শিক্ষা কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে আবার দ্বিতীয় দফা শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সম্মেলনেই সর্বপ্রথম পাকিস্তানী শাসকদের শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। এরপর ১৯৫২ সালে মৌলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বাধীন শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি, ১৯৫৯ সালের শরীফ কমিশন, ১৯৬৬ সালের হামুদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৯ সালের নূর খান কমিশনে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য আরো মূর্তরূপে প্রকাশ পায়। পাকিস্তানী শাসকদের শিক্ষা সংকোচনের উদ্দেশ্য সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ পায় ১৯৫৯ সালে প্রণীত শরীফ কমিশনের রিপোর্টে।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারাণ করতে গিয়ে শরীফ কমিশন বলছে, "দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের সম্পদ সীমাবদ্ধ বলিয়া কিছুকাল পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। ... একটা গণতান্ত্রিক সমাজে এই ব্যবস্থার আশু ফল হইবে এই যে, যাহারা শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হইবার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত

তাদের জন্য বৃত্তি, পুরষ্কার ও সরকারি সাহায্যের বন্দোবস্ত করিতে হইবে-দেশের বেশির ভাগ লোকই যেখানে আর্থিক অভাবগ্রস্ত তেমন পরিস্থিতিতে এই বন্দোবস্ত সকলের জন্য করা সম্ভব নহে।" শিক্ষা উন্নয়নের জন্য অর্থ-সংস্থান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "... শিল্পে মূলধন বিনিয়োগকে আমরা যে নজরে দেখি অনেকটা সেই নজরে শিক্ষা বাবদ অর্থ ব্যয়কে দেখার, অর্থাৎ উহাকে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির একটি অপরিহার্য উপায় হিসেবে দেখার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হয়।" এই যৌক্তিকতা হচ্ছে, শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করা। কমিশন আরও স্পষ্ট করে বলছে, "শিক্ষা সস্তায় পাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষতঃ বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি এবং কারিগরি বিদ্যা ব্যয়বহুল।" শিক্ষাকে একদিকে তারা ব্যয়বহুল করতে চেয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের কাঁধেই তার দায় চাপিয়েছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, "শিক্ষার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে খুব সামান্যই অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়েছে, এবং আরও স্কুলের জন্য জনসাধারণ যতটা দাবী জানাইয়া থাকে উহার অনুপাতে ব্যয় বহনের অভিপ্রায় তাদের কখনই দেখা যায় নাই। অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল এবং নামমাত্র বেতনের মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের জন্য সরকারের উপর নির্ভর করাই জনসাধারণের রীতি। তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, 'অবৈতনিক' শিক্ষার ধারণা, বস্তুতঃ অবাস্তব কল্পনা মাত্র। ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে স্কুলে পড়িলেও শিক্ষকগণকে বেতন দিতে হইবে, উপকরণ ও সরঞ্জাম কিনিতে হইবে, এবং স্কুল গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে।

... .. অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থার জন্য সকল লোককেই আরও বেশি পরিমাণে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে আমরা প্রস্তাব করিয়াছি যে, স্কুল গৃহের ব্যবস্থা করিবে স্থানীয় অধিবাসীগণ। ... মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে আমরা সুপারিশ করিয়াছি যে, উহার ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ বেতন হইতে আদায় করা হউক এবং মাধ্যমিক স্কুলসমূহের পরিচালকগণ ও সরকার প্রত্যেকে শতকরা ২০ ভাগ করিয়া বহন করুন।

এ ক্ষেত্রে পিতামাতাদের ত্যাগ স্বীকারের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইবে। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও আশা করা যায় যে আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী ছাত্র বেতন বর্ধিত করা হইবে এবং জনসাধারণকেও সেই অনুপাতে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে জনসাধারণ এইসব ত্যাগ স্বীকারে সম্মত হইবে। শিক্ষার দ্বারা শেষ পর্যন্ত তারাই উপকৃত হইবে।" জনগণের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা সম্পূর্ণভাবে ওয়াকেবহাল হয়েও এভাবে তারা শিক্ষাকে সংকুচিত করারই সুপারিশ করেছিলেন। যদিও প্রবল ছাত্র আন্দোলনের মুখে এ রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হতে পারে নি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই এ কমিশন গঠিত হওয়ার কারণে দীর্ঘ ২৪ বছরের ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সদ্য স্বাধীন দেশে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং শাসকদের প্রতিশ্রুতি তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না বিধায় কমিশনের পক্ষে কিছু কিছু বিষয় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। রিপোর্টের সূচনাতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

"১ .১ শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়নের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাঁদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা কমিশনের প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। .. "

"১ .২ ... শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।"

"১ .৫ দীর্ঘদিনের শোষণ জর্জরিত সমাজে দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে বিশেষ হাতিয়ার রূপে প্রয়োগ করতে হবে। সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান দ্বারা জাতীয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে।"

এমনিতর বহু চিত্তাকর্ষক বক্তব্য ছাড়াও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত একই পদ্ধতির বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তাদের সুপারিশ ছিল ইতিবাচক। তবে এসব কিছু ভাল ভাল কথা বলার পরই খুদা কমিশন শাসকশ্রেণীর শিক্ষা সংকোচনের পুরনো নীতিতে ফিরে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা কোন প্রকার রাখ-ঢাক না করেই ঔপনিবেশিক আমলে গঠিত শরীফ কমিশনের আক্ষরিক অনুবাদ করেই সুপারিশের কাজ সেরেছে।

যেমন ঃ- "১. যারা উচ্চশিক্ষা থেকে লাভবান হবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে, শুধুমাত্র তাদের জন্যই উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।" "২. শিল্পে মূলধন বিনিয়োগকে আমরা যে নজরে দেখি অনেকটা সেই নজরে শিক্ষাবাবদ অর্থ ব্যয়কে দেখার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হয়।" "৩. ... মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা সম্পর্কে আমরা সুপারিশ করি যে, এর ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র বেতন হতে আদায় করা হোক এবং অন্যান্য উৎস থেকে যা পাওয়া যাবে তা সহ সরকার বাকী ৫০ ভাগ বহন করুক। ... .. বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আশা করা যায় যে, ছাত্র বেতন বর্ধিত করা হবে। এবং জনসাধারণকেও সে অনুপাতে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।" এইভাবে সদ্য স্বাধীন দেশের তৎকালীন শাসকশ্রেণী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অঙ্গীকার এবং ছাত্র-জনতার শিক্ষার দাবি ও আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করেছে।

বৃটিশ-পাকিস্তানী উপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোয়া দুইশত বছর লড়াই সংগ্রামের পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশে সদ্য প্রতিষ্ঠিত শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শাসন-শোষণকে বহাল রাখতে যতটুকু শিক্ষা প্রয়োজন তার বাইরে স্বাভাবিক কারণেই এই কমিশনের দৃষ্টি যায় নি। সকল মানুষকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার তাগিদ ও আয়োজনের সুপারিশের পরিবর্তে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে তাতেই কমিশন বিরক্তি প্রকাশ করেছে। কমিশন বলছে, "বর্তমানে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন হওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষার মানের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত বেকারের দল অনন্যোপায় হয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অহেতুক ভিড় জমাচ্ছে।"

"সমাজের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগসূত্রবিহীন এ শিক্ষা সমাজের বর্তমান চাহিদা মেটাতে অক্ষম। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা সরকারি চাকুরি লাভের ছাড়পত্র মাত্র। কাজেই চাকুরির সংস্থান হবার বা সম্ভাবনা ফুরাবার সঙ্গে সঙ্গে এ শিক্ষার কার্যকারিতাও নিঃশেষিত হয়ে যায়। অনেকের জন্য অবশিষ্ট থাকে শুধু বেকারত্বের অভিশাপ। যে সমাজে শতকরা প্রায় আশিজন নিরক্ষর, সে সমাজে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বেকারের অস্তিত্ব সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতারই পরিচায়ক।"

বেকারত্বের জন্য শিক্ষাকে দায়ী করে এবং সকল মানুষকে শিক্ষার উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আড়াল করার জন্য তথাকথিত উৎপাদনমুখী কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারের কথা বলা হয়েছে। "... .. আমাদের অবস্থা এমন নয় যে, ১৪ থেকে ২২ বছর বয়সের সকল তরুণকে বা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে আমরা সর্বক্ষণের জন্য শিক্ষায় নিযুক্ত রেখে উৎপাদনমুখী কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি"। অন্যত্র আবার বলেছে, "বর্তমানে দেশে কয়েক হাজার ডিপ্লোমা প্রাপ্ত টেকনিশিয়ান বেকার অবস্থায় আছে। প্রতি বছর প্রায় দু'হাজার শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা নিয়ে বের হচ্ছে। এদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বেকার থেকে যাচ্ছে। ... এ বেকার সমস্যা লাঘব করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করছি ঃ 'পরিকল্পনা কমিশনের জনশক্তি বিভাগ দ্বারা দেশে বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। যে সব ক্ষেত্রে বর্তমানে টেকনিশিয়ানদের চাহিদা কম, সেসব ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা আপাততঃ কমিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।"

নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে অতি পশ্চাদপদ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়ে কমিশন বলেছে, "মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি থাকা দরকার। কারণ প্রতিটি মেয়েকেই গৃহে জীবনযাপন করতে হবে এবং সে বিষয়ে প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক। ... .. একই সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং পারিবারিক সেবাও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।"

"অষ্টম শ্রেণীর লেখাপড়া শেষ করে আমাদের দেশের বহু মেয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায় না। সুতরাং তাদের পাঠ্য বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়সূচি থাকা একান্ত অবশ্যকঃ শিশুর যত্ন, রুগীর সেবা, স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যপুষ্টি, খাদ্য প্রস্তুত, খাদ্য সংরক্ষণ, সূচীশিল্প ও পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরি, পুতুল ও খেলনা তৈরি, বাঁশ, বেত ও পাট প্রভৃতি কাজ, পাটি ও মাদুর বোনা, হাঁস-মুরগি ও গৃহপালিত পশুপালন ইত্যাদি।"

এভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে স্বাধীন দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনও ধারণ করতে পারে নি।

বরং বিস্ময়কর হলেও সত্য, শিক্ষানীতির মূল প্রশ্নে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী শক্তি আওয়ামী লীগ এবং মুক্তিযুদ্ধের কথিত ঘোষকের দল বিএনপি-উভয়ের সাথেই পাকিস্তানী উপনিবেশিক শক্তি এবং তাদের দোসর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী জামাত-শিবিরের দৃষ্টিভঙ্গির মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। রাষ্ট্র পরিচালনার অপরাপর সকল ক্ষেত্রে, যথা শিল্প-কৃষি-স্বরাষ্ট্র-পররাষ্ট্র-বাণিজ্য ইত্যাদি নীতিগত প্রশ্নেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য রয়েছে। কারণ শ্রেণী স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির গন্ডী কারোর পক্ষেই অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ফলে আজ যারা আক্ষেপ করে বলেন-কেন হারিয়ে গেলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, কেন আমরা বাস্তবায়িত করতে পারিনি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা গণ-আকাঙ্ক্ষা? কেন পরাজিত মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পেরেছে? কেন রাজাকার-আলবদর নেতাদের গাড়িতে স্বাধীন বাংলার পতাকা শোভা পাচ্ছে?-ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে এই বিষয়টির দিকে মনোযোগ দিলে, যেখানে স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর মনোজগতেই মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির চেতনা এখন লালিত হচ্ছে আর পাকিস্তানী এবং তাদের সহযোগিদের নীতি ভিন্ন আদলে বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাধীন দেশের শাসকরাই গ্রহণ করেছে এবং তা অব্যাহত রাখা হয়েছে। তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশের মিনি-পাকিস্তানে পরিণত হওয়া কিংবা পরাজিত মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িক শক্তি পুনরুজ্জীবিত হওয়াই স্বাভাবিক।

বিষয়টি বোঝার সুবিধার্থে এখানে দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরা যায়। পাকিস্তান আমলে তৎকালীন শাসকশ্রেণী এবং মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি যে ধরনের শিক্ষানীতির দাবি এবং বাস্তবায়নের পথ নিয়েছিলেন তাকে প্রতিধ্বনিত করে ইসলামী ছাত্র শিবির কর্তৃক ২৯ ও ৩০ জুলাই, ১৯৭৮-এ ইসলামী শিক্ষা সেমিনারের সুপারিশমালায় বলা হয়, "মাধ্যমিক স্তর হতেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন। কেননা দেশকে বেকারত্বের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এটা একটা কার্যকরী পদক্ষেপ। উচ্চ শিক্ষাকে বেকারত্বের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিভাগের পুনর্গঠন প্রয়োজন। সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষায় ছাত্র ভর্তি এমনভাবে করতে হবে যাতে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে বের হওয়ার পর একজন যুবককেও বেকারত্বের শিকার হতে না হয়। শিক্ষাকে অবশ্যই উৎপাদন ও কর্মমুখী করার কার্যকরী ব্যবস্থা এখন থেকেই গ্রহণ করতে হবে।"

"আমাদের প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে বেকার তৈরীর কারখানায় পরিণত হয়েছে। ফলে জনশক্তির যে বিরাট অংশ দক্ষতা অর্জনে এবং তা কাজে লাগিয়ে জাতির উন্নয়নের পথে সাহায্য করতে পারতো তারাই জাতির উন্নয়নের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৯১]

শিক্ষা সম্পর্কে জামায়াত নেতা যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম রচিত 'বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী' পুস্তিকায় বলা হয়েছে, "কিশোর ও যুবকদের হাতকে উৎপাদনের যোগ্য বানাবার জন্য সংক্ষিপ্ত টেকনিকেল শিক্ষা ব্যাপক না করায় শিক্ষা দ্বারা বেকারের মিছিলকে বৃদ্ধিই করা হচ্ছে।" এই পুস্তিকায় যদিও বলা হয়েছে, "শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবেকবান মানুষ গড়া" কিন্তু এই তথাকথিত মানুষ গড়ার বুলি যে কত স্থূল ও শিক্ষাবিরোধী তা ধরা পড়ে যখন তিনি বলেন, "... আমাদের গরীব দেশের সম্পদ কি করে বাড়ান যায় সে শিক্ষার জন্য কলেজের মতো দালান, এমনকি হাই স্কুলের মতো ঘর না হলেও চলতে পারে। পশু পালন, হাস-মুরগী বৃদ্ধি, মাছের সস্তা চাষ, ফল-মূল শাক-শব্জি উৎপাদনের জ্ঞান নিরক্ষর লোকদের মধ্যেও বিতরণ করা সম্ভব।" ঐ পুস্তিকাতেই তিনি লিখেছেন, "আমরা দীর্ঘ কোর্সের ব্যয়বহুল এম.বি.বি.এস ডাক্তার দিয়ে ৯ কোটি মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন ১৫০ বছরেও পূরণ করতে পারব না। এর জন্য গ্রামে থাকতে রাজী স্বল্প-মেয়াদী কোর্সের বিরাট চিকিৎসক বাহিনী সৃষ্টি করতে হবে। ... জাতীয় সম্পদের বিরাট অংশ ব্যয় করে আমরা দামী ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করছি। অথচ তাদেরকে কাজ দিতে পারি না বলে তারা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।"[৯২]

মিলিয়ে দেখুন; আওয়ামী লীগ-বিএনপির শিক্ষানীতির বক্তব্যের সাথে পাকিস্তানী সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের আমলের শরীফ কমিশনের বক্তব্য এবং গোলাম আযমদের শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে তেমন মৌলিক কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় কি না? ফলে এভাবেই শিক্ষাসহ সকল প্রশ্নে ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণী এবং তাদের দোসরদের নীতি বাস্তবায়নের পথ ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশের হৃদয়ে পাকিস্তানের আত্মা গুঁজে দেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করা হয়েছে। মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতাকে আশঙ্কাজনক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে।

দ্বি-দলীয় ধারায় বিভক্ত শাসকশ্রেণীর শিক্ষানীতি একই উদ্দেশ্যে প্রণীত

অতীতের শিক্ষা সংকোচনের নীতিকে বহাল রেখে তথাকথিত কর্মমুখী, উৎপাদনমুখী শিক্ষার কথা বলে বিএনপির সামরিক শাসনামলে কাজী জাফরের শিক্ষা প্রস্তাবনা বাস্তবে আলোর মুখ দেখে নি। ১৯৮৩ সালে এরশাদের সামরিক শাসনের সময় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খানের প্রণীত

শিক্ষানীতিও জঙ্গী ছাত্রআন্দোলনের মুখে বাস্তবায়িত হতে পারে নি। আওয়ামী লীগ আমলে প্রণীত শামসুল হক কমিটির রিপোর্টও সরকার বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষানুরাগী মহলের প্রতিবাদের মুখে বাস্তবায়িত করতে পারে নি। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন নীতি ছাড়াই চলছে? বেশ কিছু মানুষের মধ্যেও এ ধরনের ভ্রান্তি রয়েছে যে দেশে কোন শিক্ষানীতি কার্যকর নেই। বাস্তবে এটা ঠিক নয়।

শাসকগোষ্ঠী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুমোদিত কোন শিক্ষানীতি অনুসরণ করে চলছে না, এটা ঠিক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে না এবং শিক্ষার প্রশ্নে তাদের কোন নীতিগত অবস্থান নেই। শিক্ষার অর্থায়ন, শিক্ষাপদ্ধতির বিন্যাস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালন ব্যবস্থা, শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং সিলেবাস-কারিকুলাম, এমনকি পরীক্ষা পদ্ধতি ও পাশ-ফেলের হার নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন নীতিগত অবস্থান তাদের রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, শাসকরা যদি শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের নীতি বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়েই থাকে তাহলে বছর বছর ঢাক পিটিয়ে শিক্ষানীতির ঘোষণা দিতে যায়-ই বা কেন, আর কেনই বা অহেতুক ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের মুখে পড়ে? আসলে ক্ষমতার পট পরিবর্তন যতই হোক, শোষণ-শাসনের একই নীতির অনুসারী প্রতিটি সরকারই চায় তাদের গণবিরোধী শিক্ষাসংকোচন নীতিকে নানা মোড়কে সাজিয়ে ছাত্র-জনতাকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে। কারণ তা হলে জনগণকে শিক্ষার মৌলিক-মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দায় শুধু শাসকগোষ্ঠীর উপর থাকে না, জনগণের উপরও জনমতের নামে তা চাপিয়ে দেয়া যায়। শিক্ষার প্রশ্নে এখনও গণমানসে যতখানি সচেতনতা এবং অধিকার বোধ জাগ্রত রয়েছে তাকে বিভ্রান্ত করে জনগণের দ্বারাই গণবিরোধী শাসকশ্রেণীর নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি জায়েজ করিয়ে নেয়া যায়। এতে স্বেচ্ছাচারের গায়ে আইনী প্রলেপ দেয়া এবং স্বৈরতান্ত্রিক শিক্ষানীতিকে গণতন্ত্রের পোষাকে সজ্জিত করা চলে। এ বিষয়টি বোঝা দরকার।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ-বিএনপি এই দুই দলের পরস্পর বিরোধীতাই শুধু নয়, মারমুখী অবস্থানের কথাও কারও অজানা নয়। কিন্তু রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা, দুর্নীতি ও কালো টাকার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে শোষণ করা, জীবন ধারণের সকল অধিকার থেকে শ্রমজীবি মানুষদের বঞ্চিত করা এবং সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু থাকার ক্ষেত্রে এদের অবস্থান যে সম্পূর্ণ অভিন্ন তা দেশবাসী নিয়তই দেখতে পাচ্ছেন। পাশাপাশি উভয়ের শিক্ষানীতিও যে এক স্রোতে প্রবাহিত এবং অতীত কমিশনগুলির শিক্ষা সংকোচনের ধারাবাহিকতা-তা-ও সচেতন কোন মহলই অস্বীকার করতে পারবে না।

আমাদের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বিবৃত সর্বজনীন, একমুখী শিক্ষার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত শামসুল হক কমিটি কিভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করে সর্বজনীন শিক্ষার বিপরীতে বহুধারার শিক্ষা বলবৎ রাখার সুপারিশ করেছিল, তা আমরা দেখিয়েছি। তারা বলেছিল, "সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্য আছে: বৈষম্য আছে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। তাছাড়া ক্যাডেট কলেজ, রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, ল্যাবরেটরি স্কুল, শাহীন স্কুল, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে বৈষম্যের কারণ হয়েছে। ... স্বাধীন দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হলে এসব সমস্যার যথাযোগ্য সমাধান বের করা প্রয়োজন।" কিন্তু সমাধান হিসেবে তারা বলেছিল, "মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণ, মাদ্‌রাসা ও কারিগরি-এ তিনটি ধারায় বিভক্ত। এ তিনটি ধারার বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বৈষম্যহীন স্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই স্তরের সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষা-কার্যক্রমের মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় প্রয়োজন।"

প্রায় একই বক্তব্য দিয়ে মিঞা কমিশন বলেছে, "হঠাৎ করেই আজ যেহেতু এসব ধারা পরিবর্তন করা বাস্তবসম্মত নয় সেহেতু অন্তত বিভিন্ন ধারার মধ্যে বিস্তৃত অংশ যাতে সমসত্ত্ববিশিষ্ট হয় সে লক্ষ্যে কারিকুলাম প্রণয়নের প্রচেষ্টা।" বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা, কিন্ডার গার্টেন, ইবতেদায়ি মাদরাসা, বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে পাঠ্যসূচির শুধুমাত্র একটা অংশ অভিন্ন করলেই কি বৈষম্য ঘুচবে? বাস্তবে তা ঘুচবে না। আর মাদ্রাসা শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি ধারা নিয়ে মিঞা কমিশন আলোচনা করলেও ক্যাডেট কলেজ, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, এ-লেভেল/ও-লেভেল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা সযত্নে এড়িয়ে গেছে। ফলে নানা কথার মারপ্যাঁচে বর্তমান বহুধারা ও বৈষম্যকেই এরা জায়েজ করার ব্যবস্থা করেছে মাত্র।

আর একটা কথা, মিঞা কমিশনের প্রধান ড. মনিরুজ্জামান মিঞা ১৯৯৯ সালের ১৬ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ৬ দিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে তাঁর মতামত রেখেছিলেন। 'শিক্ষা দর্শন ও প্রাইভেটাইজেশন' শিরোনামের অধিবেশনে সেদিন তিনি বলেছিলেন, "সংবিধানে কিন্তু বর্ণিত রয়েছে শিক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল অব স্টেট পলিসি যেখানে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে শিক্ষা হতে হবে একমুখী অর্থাৎ ইউনিফরম। ... শিক্ষা হতে হবে সর্বজনীন এবং শিক্ষার অধিকার হতে হবে সকলের। এই ধরনের একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ... .. আমার মনে হয় এই দাবি প্রথম হওয়া উচিত যে, রাষ্ট্রের যেহেতু দায়িত্ব রয়েছে সর্বজনীন শিক্ষা দেবার; তা রাষ্ট্র আগে পালন করুক। ... আমেরিকা পুঁজিবাদী দেশ হয়েও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত রাষ্ট্র সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে। ... উচ্চমাধ্যমিক বা ১২ গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সে সমস্ত দেশ পালন করছে। তবে এদেশে কেন হবে না? হওয়া প্রয়োজন এ কারণে যে, যদি আমরা ইউনিফরম শিক্ষা চাই, যদি আমরা শিক্ষার অধিকারকে প্রত্যেকের দরজায় নিয়ে যেতে চাই; তাহলে এই বিরাট দায়িত্ব কিন্তু রাষ্ট্র ছাড়া আর কেউ পালন করতে পারবে না। ... আমরা হয়তো একমত হতে পারি যে অন্তত রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত। শিক্ষা যাতে সকলেই পেতে পারে, ধনী-দরিদ্র সকলেই পাবে। সেটিই হবে রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য।" তিনি আরও বলেছেন, "... সর্বজনীন শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নতি হবে না। দারিদ্র্য বিমোচন হবে না, সমাজের মধ্যে সমতা আসবে না। আর তার জন্য আমরা, এক: সেই ধরনের শিক্ষা চাই, দুই: এটা রাষ্ট্রের দায়িত্বে হতে হবে। অন্তত আমি বলবো উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পযন্ত সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা যাতে সকলের দ্বারে পৌঁছাতে পারে সেই দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রকে সেই দায়িত্ব পালন করতেই হবে। তা যদি না পারে, যারা পারবে না, তাদের রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ না করাই উচিত হবে।"[৯৩] অথচ সেই মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে গঠিত কমিশনে যখন ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুপারিশ আসে, কিন্ডারগার্টেন-মাদ্রাসা ইত্যাদি বহু ধারা টিকিয়ে রাখার সুপারিশ করা হয়, তখন তাঁর সেদিনের বক্তব্য ও অঙ্গীকারের সাথে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

প্রাথমিক শিক্ষা অংশে সুপারিশ করতে গিয়ে কমিশন বলছে, "প্রতি ১৫০০ জনসংখ্যার জন্য অন্তত একটি প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয় স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে এবং এজন্য সরকারি উদ্যোগে প্রতি বছর অন্যূন ১০০টি পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।" কমিশন ঘোষিত এই নীতিমালা মোতাবেক বর্তমানের ১৪ কোটি জনসংখ্যাকে স্থির ধরে রেখে হিসাব করলে আমাদের দেশে ৯৩,৩৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন হয়। কমিশনের হিসাব মতে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে দেশের মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৮,১২৬টি। অর্থাৎ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ি দেশে এখনো ১৫,২০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব রয়েছে। কেবল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হিসাবে প্রতি বছর ১০০টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করলে এই চাহিদা পূরণ করতে ১৫২ বছর সময় লেগে যাবে! ফলে এ কথা খুব সহজেই অনুমেয় যে কমিশনের সুপারিশ কতখানি হাস্যকর ও তাদের কথিত শিক্ষা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার সাথে কতটা বিরোধপূর্ণ। ফলে কমিশনের সুপারিশ কি ফল বয়ে আনতে পারে, তা বুঝতে কারও কষ্ট হয় না। আর কমিশন যখন বলে, "বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত করতে হবে ..." তখন এ আশঙ্কাই স্পষ্ট হয় যে শিক্ষার দায়িত্ব সরকার নেবে কেবল নামকাওয়াস্তে।

শামসুল হক কমিটি জনগণের শিক্ষার দায়ভারকে অস্বীকার করে অভাব-দারিদ্র্যে পিষ্ট মানুষের অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে 'কর্মমুখী শিক্ষার' শ্লোগান তুলেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার ভূমিকাতে বলা হয়েছিল, "... যারা শিক্ষাক্ষেত্রে ওপরের দিকে যেতে চাইবে না বা উপযুক্ত বিবেচিত হবে না তারা এই স্তরে লব্ধ বৃত্তিমূলক বিষয়ে দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে উপযোগী জীবিকা অবলম্বন করতে পারবে। ... কাজেই এ স্তরের শিক্ষায় যেমন একদিকে থাকবে জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন ধারার সমাহার, আর অন্যদিকে থাকবে জীবন ও জীবিকা নির্ভর হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা।" "উচ্চপ্রাথমিক স্তরে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের জীবন ও পরিবেশের উপযোগী কিছু না কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক শিক্ষা শেষে যারা আর বিদ্যালয়ে পড়বে না তারা এ শিক্ষার ফলে বাস্তব জীবনে সহজে কর্মসংস্থান নিতে পারবে।" আর মিঞা কমিশন বলেছে, "জীবনমুখী শিক্ষা : মাধ্যমিক শিক্ষা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরাও সমাজে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতে পারে।" "প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করে শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।"

সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ক্ষেত্রে এই দুই শিক্ষানীতির সাযুজ্যও চোখে লাগার মতো। শামসুল হক কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "ইসলামী বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হলে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ইসলাম শিক্ষা গ্রহণ এবং স্বীয় জীবনে তা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। তাই ইসলাম শিক্ষাকে

মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আল্লাহতায়ালার প্রিয় বান্দাহ ও রাসুলুল্লাহ (সঃ)-র সত্যিকার অনুসারী উম্মত এবং সমাজের যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে সৎ ও চরিত্রবান, দেশপ্রমিক ও সুনাগরিক তথা মহৎ মানুষ রূপে গড়ে তোলায় সাহায্য করাই ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য। উপরোক্ত মূল লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ইসলাম শিক্ষার নিম্নবর্ণিত সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা বাঞ্ছনীয়।"

"শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং আল্লাহতায়ালার একত্ববাদ ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।"

একই কথা বলেছে মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে তাদের প্রথম কথাটি হলো, "শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে সহায়তা করে।"

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে শামসুল হক কমিটির সুপারিশে নৈতিকতার দোহাই দিয়ে বলা হলো, "মাদরাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করা। শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতালা ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।"

"মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ইসলামের যথার্থ সেবক ও রক্ষকরূপে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা। তাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতিকে ভাল করে জানে, সে অনুসারে সুদৃঢ় নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ও তার উন্নয়ন বিধানে উদ্যোগী হয়।"

"বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে।"

মিঞা কমিশনও মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার এবং একে আরও পুষ্ট করার পক্ষেই মত দিয়েছে। 'মাদ্রাসা শিক্ষা' অধ্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপরন্তু প্রস্তাব করা হয়েছে, "অবিলম্বে ফাজিলকে ব্যাচেলর ও কামিলকে মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদান" করার এবং এই ডিগ্রী প্রদান করার জন্য "স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।"

শামসুল হকের শিক্ষানীতির 'উচ্চশিক্ষা' অধ্যায়ের ভূমিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার কথা স্বীকার করে নেয়া হলেও বাস্তবে তা স্পর্শকাতর বিধায় এ সংক্রান্ত কোন সুপারিশ করা থেকে বিরত থেকেছে। তারা ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশের ফলে দেশের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় সীমিত অর্থে যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে তাকে আরো বিকশিত করা, সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার সুপারিশ তো করেই নি, উল্টো ১৯৯২ সালে বিএনপি সরকারের প্রবর্তিত 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়'-এর যৌক্তিকতা নিয়ে সাফাই গেয়েছে। রিপোর্টের ৯ নং অধ্যায়ে ১৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, "দেশের বাস্তবতা এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন স্বীকার করতে হয়।"

আবার রিপোর্টের ৯ অধ্যায়ের ২.৪.১ ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "... সর্বৈব ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী"; এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে ১৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, "এইসব বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) কোনভাবেই সাম্প্রদায়িক ও বাণিজ্যভিত্তিক হতে পারবে না এবং মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী হতে পারবে না।"

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল এহসান ইউনিভার্সিটি-এগুলোর নামের মধ্য দিয়েই বোঝা যায় যে মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে এরা কতখানি ধারণ করে। আবার ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি (আইউবিএটি)-এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে লক্ষাধিক টাকার উপরে খরচ করতে হয়। ফলে এ সব প্রতিষ্ঠান আগাগোড়াই যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং এরা জাতীয় চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনটাই যে ধারণ করে না সে বিষয়েও কমিটির কোন বক্তব্য ছিল না।

আর বর্তমান মিঞা কমিশন বলেছে, "উচ্চশিক্ষা যেহেতু ব্যয়বহুল সেহেতু বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।" উচ্চ শিক্ষা ব্যয়বহুল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে তা কি সস্তা হয়ে যাবে?

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের শিক্ষা সম্মেলনে কমিশনের প্রধান মনিরুজ্জামান মিঞার দেওয়া বক্তব্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। সেখানে তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলেছিলেন, "এই সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চেহারা কি? হাজার বা পনেরশত square feet-এর আমাদের যেটা flat বাড়ির আয়তন, ওরকম একটা flat বাড়ির আয়তনের মধ্যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ৩/৪ বছর ধরে ... function করছে, কিন্তু সে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যও নেই। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকও নেই। Registrar-ও নেই, কিছুই নেই।... সেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ করলে দেখা যাবে যে শিক্ষকও নেই ...। ... এর নাম কি বিশ্ববিদ্যালয় নাকি? আসলে এগুলো money making machine সৃষ্টি করা হয়েছে। ... ঐ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় চলতে দেয়া বোধ হয় সমাজের জন্য ক্ষতিকর, যেখানে কোন রকম ব্যবস্থাপনা নেই। যেখানে কোন library নেই, যেখানে কোনো গবেষণাগার নেই। যেহেতু computer বিজ্ঞান এবং MBA-এর একটা চাহিদা আছে আজকের সমাজে, দেশে এবং বিদেশে, তাই কয়টা ঘর নিয়ে ১ লাখ টাকা করে বেতন নিয়ে সেগুলোকে চালু করা হয়েছে। ... এবং কেন তারা এরকমভাবে চালাচ্ছে তার কিন্তু কোনো transparency-ও নেই। অর্থাৎ জানতে পারবেন না কোনো দিন আপনি যে কত টাকা-পয়সা তারা কোথা থেকে রোজগার করছে, কিভাবে তারা খরচ করছে।"[৯৪]

যে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে এতো সব গুরুতর অভিযোগ ড. মনিরুজ্জামান মিঞার, তারই নেতৃত্বাধীন কমিশন সেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকেই উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করলেন!

মিঞা কমিশনের প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত আলাদা অধ্যায় আছে। তাত্ত্বিক আলোচনায় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনের স্বীকৃতিও আছে। এই স্বায়ত্তশাসন কেন বাধাগস্ত হয়, সে নিয়েও তারা বিশদ আলোচনা করেছেন। কিন্তু সুপারিশ করার বেলায় তারা বলছেন যে, ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পাল্টাতে হবে। এখন যেমন সিনেট ৩ জনের উপাচার্য প্যানেল ঠিক করতে পারে, এ অধিকারটুকুও কমিশন কেড়ে নিতে চায়। কমিশন বলছে, উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠন করতে হবে। এর চেয়ারম্যান হবেন সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি এবং ৬ জন সদস্য হবেন চ্যান্সেলর মনোনীত ৩ জন শিক্ষাবিদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনোনীত ১ জন শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান। এ সার্চ কমিটি কিভাবে নাম সংগ্রহ করবে তা তারাই নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ সমস্ত কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবেই তুলে দেয়া হচ্ছে সরকারের হাতে।

স্বায়ত্তশাসনবিরোধী বলে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীসহ সর্বমহল থেকে প্রত্যাখাত 'অভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা' চালুর প্রস্তাব করেছে কমিশন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে ব্যাপক খবরদারির অধিকার দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। অথচ এ সংস্থার কাজ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন জেনে নিয়ে সরকারের সাথে আলোচনা করা, যা কমিশনের রিপোর্টেও বলা আছে। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে মঞ্জুরী কমিশন প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিরোধেও মঞ্জুরী কমিশনকে নাক গলানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে রিপোর্টে।

উচ্চশিক্ষা সংকোচনের ক্ষেত্রে বেতন-ফি বৃদ্ধির জন্য শরীফ, খুদা কমিশন যতটা সরাসরি বলেছে-শামসুল হক কমিটি তা সরাসরি বলে নি। ২৫ অধ্যায়ে অর্থায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইদানীং বিভিন্ন ফোরামে আলোচিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন, প্রায় ৫০ বছর এই বেতনের হারে কোন পরিবর্তন করা হয় নি। এর ফলে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব একটু স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে অনেকেই দেখছেন। বেতন বৃদ্ধি করতে হলে তা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচিত হওয়া দরকার। বেতন বৃদ্ধি করতে হলে একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে।"

আর মিঞা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "অর্থ বরাদ্দের দিক থেকে সরকারের ক্ষমতাও সীমিত। তাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে তাদের নিজেদের আয়ের উৎস খুঁজতে হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন অতি নগণ্য। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহযোগিতা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া যেহেতু দেশের বহু কলেজে এখন অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স শুরু হয়েছে, তাই সাধারণ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লভ্য অবকাঠামো ও সুযোগ সুবিধার নিরিখে কাম্য ছাত্রসংখ্যা কত হতে পারে, তা ভেবে দেখতে হবে।" অর্থাৎ ছাত্র বেতন বাড়াও আর ছাত্র সংখ্যা কমাও। তারা 'কাম্য ছাত্র সংখ্যা' ঠিক করতে পারেন কিন্তু 'কাম্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' সংখ্যা ঠিক করার কথা ভাবতে পারেন না।

ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবনা স্পষ্টভাবে এসেছে প্রকৌশল ও কারিগরী শিক্ষা অধ্যায়ের সুপারিশে। বলা হয়েছে, "প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন বার্ষিক ১৮০ টাকা আর ছাত্রপ্রতি খরচ হয় ৪০,০০০ টাকা। ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করেও এ অর্থেও কিছুটা যোগান দেয়া সম্ভব কিনা, তা ভেবে দেখতে হবে।" কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে বুয়েটের ১ম বর্ষে ভর্তি হওয়ার জন্য একজন ছাত্রকে বেতন-ফিসহ নানা খাতে ১০ হাজার টাকার অধিক পরিশোধ করতে হয়েছে। কমিশন বুয়েটের নজির হাজির করেছেন, কিন্তু ক্যাডেট কলেজের একজন শিক্ষার্থীর পেছনে বাৎসারিক ৬২ হাজার ১৮ টাকা খরচের পেছনে কি যুক্তি কাজ করছে, তার কোনো ব্যাখা দেন নি।

শিক্ষার মূল নীতিগত প্রশ্নের সাথে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত

একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সরকার কি ধরনের শিক্ষানীতি নিয়ে চলবে তা নির্ভর করে কি ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর তা দাঁড়িয়ে আছে এবং কোন শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে ও স্বার্থে তা কাজ করছে-তার উপর। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে তা সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের এই যুগে চরম অবক্ষয়ের মাঝে রয়েছে বিধায় তার চলার এবং বিকাশের পথ অবরুদ্ধপ্রায়। এই বিকৃতি আমরা দেখছি চারদিকে। রাজনীতির বুর্জোয়া ধারা দুর্বৃত্তায়িত। অর্থনীতি লুটেরাদের দখলে। ১০ লক্ষ মানুষের কাছে ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ জিম্মি। সংস্কৃতি নোংরা ডোবার চেহারা নিয়েছে। শিক্ষার সংকোচন, বাণিজ্যিকিকরণ, সাম্প্রদায়িকিকরণ ইত্যাদি তারই অংশ বিশেষ।

১৯৯৭ সালে, বিগত ২৫ বছরে শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের ইতিহাস বৈষম্য বৃদ্ধিরই ইতিহাস। এই বৈষম্য প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সত্য। পঁচিশ বছরে ধনদৌলতে, বিলাসে, অবস্থানে, জীবনযাপনে পার্থক্য বেড়েছে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর। ওপরে উঠেছে কিছু মানুষ, নিচের দিকে নেমে গেছে অধিকাংশ। এই বৈষম্য শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রতিফলিত বৈকি। ... একাত্তরের যুদ্ধে ... জাতি এক হয়েছিল একটি অভিন্ন লক্ষ্যে। সেই লক্ষ্য বৈষম্যহীন একটি সমাজ গঠনের। তেমন সমাজ গঠিত হয় নি। রাষ্ট্র সাহায্য করে নি সেই লক্ষ্যে এগোতে। কেননা রাষ্ট্রক্ষমতা চলে গেছে বিত্তবানদের হাতে। শিক্ষাও সাহায্য করল না জাতি গঠনে। কেননা, শিক্ষাও চলে রাষ্ট্রক্ষমতার ইচ্ছানুসারে। সেই ইচ্ছার অনুগত হয়ে শিক্ষাব্যবস্থা বৃদ্ধি করেছে শ্রেণীগত বৈষম্য। অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত করছে জাতীয় ঐক্যকে। উন্নতির অন্তরালে এ এক আত্মঘাতী অবনতি। ... শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি বিষয়, কেননা আজকের শিক্ষাই আগামী দিনের বাস্তবতা। আগামীতে আমরা আরও বেশি হতাশ হব শিক্ষা যদি জাতিগঠনের বিপরীতে শ্রেণীগঠনের কাজে মগ্ন থাকে, এখন যেমনটি রয়েছে।"[৯৫]

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একটা শ্রেণীবিভক্ত শোষণমূলক সমাজে শাসকগোষ্ঠী তার শাসন-শোষণের প্রয়োজনে যতটুকু শিক্ষার প্রসার না ঘটলেই নয়, শিক্ষা-বিস্তার ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইবে। অথচ বুর্জোয়ারাই একসময় তাদের উন্মেষের কালে সকল মানুষকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়ার কথা বলেছে। আজ আবার তারাই জনগণের শিক্ষার মৌলিক গণতান্ত্রিক দাবিকে অস্বীকার করছে।

আজ যদি প্রচলিত ব্যবস্থা সকল মানুষকে শিক্ষিত করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা রক্ষা করতে গিয়ে কি আমরা পশুর স্তরে নেমে যাবো? নাকি মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রয়োজনে বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাবো? আমরা মানুষের মতো বাঁচার তাগিদে আমাদের অধিকারের দাবি তুলেছি। আজ ছাত্র-শিক্ষক-জনতার অতীত সংগ্রামী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে ধারণ করেই আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, মনুষ্যত্ব রক্ষার আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে।

দাবিনামা

১. প্রতি দুইশত পরিবারের জন্য অন্তত একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতক পর্যন্ত একই ধারার অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সমন্বিত শিক্ষা চালু করতে হবে।

২. বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম-পোশাক, নাস্তা, খাবার, বই, শিক্ষাসরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেডিকেল সেন্টার স্থাপন, স্থায়ী ডাক্তার নিয়োগ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মচারী সকলকে হেলথ্ কার্ড প্রদান ও হেলথ্ চেক-আপের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. উচ্চশিক্ষা হবে সবার জন্য অবারিত। উচ্চশিক্ষায় কোন প্রকার বেতন-ফি আরোপ করা যাবে না। প্রত্যেক জেলায় কমপক্ষে একটি করে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. শিক্ষার বিষয়বস্তু হতে হবে সেক্যুলার ও বিজ্ঞানভিত্তিক। শিক্ষার্থীরা যাতে সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির পার্থক্য বুঝতে পারে, সুস্থ-সবলভাবে দেহে-মনে বাড়তে পারে সে-জন্য প্রাইমারী থেকে সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, অভিনয়, আবৃত্তি, শরীরচর্চা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাধ্যতামূলক শিক্ষা কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত করে স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

৬. মেধাবী দেশপ্রেমিক ছাত্রদের শিক্ষকতা পেশায় নিয়ে আসার জন্য শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বেতন-ভাতা, সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. পরীক্ষাকে পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা পদ্ধতি যাচাই-এর আয়োজন হিসেবে দেখতে হবে।

৮. শিক্ষার্থীর শারীরিক-মানসিক সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সুনিশ্চিত করতে হবে।

৯. পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা বিধানে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০. শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

১৯৯৯ সালের ১৬ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট আয়োজিত শিক্ষা সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে কমরেড খালেকুজ্জামান-এর বক্তব্য

কমরেড সভাপতি, আমাদের মহান পার্টি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-এর কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধেয় সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, আব্দুল্লাহ সরকার, শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, সম্মানিত সুধী ও সংগ্রামী বন্ধুগণ;

আজ নিয়ে ৬ দিনে মোট ১০টি অধিবেশনে প্রাইমারী-মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষাবিদ, কর্মচারী, ছাত্র নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, কৃষক-ক্ষেতমজুর ও নারী নেতৃবৃন্দ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ,

সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ নিয়ে মোট ১২৮ জন আলোচককে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে আমি অভিনন্দন জানাই। তাঁরা কষ্ট স্বীকার করে শিক্ষা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থিত করে আমাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ এবং আলোকিত করে গেলেন, সে জন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

জাতীয় পর্যায়ের এই সম্মেলনকে সফল ও সার্থক করে তোলার জন্য সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, যারা প্রশংসনীয় শৃঙ্খলায় অখন্ড মনোযোগে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষ এবং অভিভাবকবৃন্দ, যাঁরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে ছাত্র-যুব সম্প্রদায়কে উচ্চতর নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের মোড়-ফেরানো সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, কর্মচারীবৃন্দ ও ছাত্র সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ যাঁরা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এ সম্মেলনকে পূর্ণতা দিয়েছেন, তাদেরকে অভিনন্দন। এই সম্মেলনের আয়োজনে ঢাকাসহ সারাদেশে যারা অর্থ দিয়ে, সাহস দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এ সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠান অর্থাৎ আজ উপস্থিত থাকার কথা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী, ভারতবর্ষের শিক্ষাআন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখার্জীর। কিন্তু হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় তিনি আসতে পারেন নি। আমরা তাঁর রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। তাঁর অনুপস্থিতিতে, অতি অল্পসময়ে অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ভারতের শিক্ষানীতির জন্য গঠিত অশোক মিত্র কমিশনের সদস্য, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, শিক্ষা-বাঁচাও আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রেখে এবং অংশীদার হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে রক্তিম শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা জানাই ভারতবর্ষের সংগ্রামী ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি, সারা ভারত ডিএসও'র সংগ্রামী ছাত্রনেতা চন্ডীদাস ভট্টাচার্যকে।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,
বাংলাদেশে এ ধরনের শিক্ষা সম্মেলন এটাই প্রথম। শিক্ষাবার্তা পত্রিকা, ধর্মীয় মৌলবাদী একটি সংগঠন, কতিপয় বাম প্রগতিশীল সংগঠন এবং কয়েকটি সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাবিষয়ক সেমিনার করা হলেও-বিষয়, ব্যাপ্তি এবং সামাজিক গুরুত্বের দিক থেকে এ সম্মেলন সম্পূর্ণ আলাদা।

তারচেয়েও বড় কথা, এই সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন দেশে শিক্ষা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। যতটুকু শিক্ষা আছে, তাও কুশিক্ষা এবং বিকৃতিতে ভরপুর। মনুষ্যত্বের চলছে দারুণ সংকট। মূল্যবোধগুলি ধ্বসে পড়ছে। যুবসমাজের মধ্যে নীতি-আদর্শ, সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যবোধের ধারণা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেতনা-প্রেরণা হারিয়ে যেতে বসেছে। জ্ঞান সাধনার স্পৃহা, জ্ঞান ও কর্মে মানুষ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষিত হওয়ার পথে। শোষণ এবং বৈষম্যের ধনবাদী ব্যবস্থা গত ২৮ বছরে এই জায়গায় দেশকে এনে দাঁড় করিয়েছে। শুধু তাই নয়, আজকের দিনে বুর্জোয়া রাজনীতি প্রগতির সব উপাদান হারিয়ে আদর্শহীন। তাই সমাজে তাদের প্রতিপত্তি জনগণের চরম আর্থিক দুর্দশার পাশাপাশি ডেকে এনেছে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। সেজন্যই আপনারা দেখছেন কথিত সব বড়দল-ঘনিষ্ঠ ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের কি অবস্থা। একই সংগঠন করেও একজন আর একজনের বুকে গুলি চালায়। আজই তো, এখানে যখন শিক্ষা সম্মেলনে শতশত ছাত্র-ছাত্রী ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কথা শুনছে, ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাওয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে কোন পথে, কিভাবে দাঁড় করানো যাবে-সে সমস্ত বুঝে নিতে চাইছে, ছাত্রসমাজের করণীয় কি তা নির্ধারণ করতে চাইছে, তখনই ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের কিছু কর্মী মুক্তি পণ-এর টাকা আদায় করার জন্য একটি কিশোর ছেলেকে অপহরণ করে হলে আটকে রেখেছে বলে খবর ছড়িয়েছে।

একটা বিষয় আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে, যখন দেখি, গত ৫ দিন ধরে শিক্ষা সম্মেলনে শতশত ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ ও বিবেকের প্রতিধ্বনি তুলে ধরতে পারার ক্ষমতাসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শিক্ষানীতি এবং শিক্ষার দিগ্‌দর্শনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, অন্ধকারময় বাংলাদেশের সামনে ভবিষ্যতের আশার আলো জ্বালার মতো করে দিক নির্দেশনা তুলে ধরছেন, তখন প্রতিষ্ঠিত দৈনিক কাগজগুলোতে কোন খবরই নেই। কিন্তু এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই শতশত ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষাবিদদের সম্মেলনের পরিবর্তে যদি দুই চারজন ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী গুলি চালিয়ে, বোমা ফাটিয়ে একটা তান্ডব সৃষ্টি করতো তাহলে পত্রিকার প্রথম পাতায় তা ছাপা হতো। এতে কি হয়? তা কি

মানবিক বিকাশ ও সুকুমারবৃত্তির জয়কে নিশ্চিত করার শর্ত সৃষ্টি করে, না পশুবৃত্তির প্রাধান্যই মানবমনে গেঁথে দেয়? একথা আজ সাংবাদিক-সংবাদপত্রসেবীদের গভীরভাবে ভাবতে হবে।

শিক্ষা সম্মেলনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়েছে, আপনারা শুনেছেন। একথা আপনাদের ভালভাবেই জানা আছে যে, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ সারা দেশের জনগণের মৌলিক-গণতান্ত্রিক অধিকার শিক্ষা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বৃটিশ এবং পাকিস্তান আমলে পূরণ হয় নি। হওয়ার কথাও ছিল না। কারণ তখন আমরা পরাধীন ছিলাম। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও সে-আকাঙ্ক্ষা অপূরিতই থেকে গেল। কেননা লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ এবং সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শোষণের পরিবর্তে ধনবাদী শোষণের ব্যবস্থাটাই শুধু আমরা পেলাম। জনগণের প্রকৃত শাসন তথা শোষন-বঞ্চনামুক্ত সমঅধিকারের সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা গেল না।

আমাদের দল বাসদ ১৯৮০ সালে জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষার অধিকারের দাবিতে সোচ্চার ছিল। ৮০-র দশকে স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনামলে কুখ্যাত মজিদ খান তার পূর্বসূরীদের শিক্ষা সংকোচনের নীলনক্সাকেই শিক্ষানীতির প্রস্তাব হিসেবে নতুন মোড়কে হাজির করে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শহীদ হন অসংখ্য ছাত্র-জনতা, লাঞ্ছিত হন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিভিন্ন স্তরের সচেতন মানুষ। অবশেষে '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ শাহীর পতন ঘটে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল। তারা প্রণয়ন করেছিল ঐতিহাসিক ১০ দফা। ঐ সময় আন্দোলনরত তিন জোটের পক্ষ থেকে প্রণীত রূপরেখায় ছাত্রসমাজের ১০ দফা মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। কিন্তু '৯১-এর নির্বাচনে বিএনপি এবং '৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে দশ দফার মূল সারমর্মকে পাশ কাটিয়ে অতীতের গণবিরোধী শিক্ষানীতিই বহাল রাখে। সর্বশেষ আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে অধ্যাপক শামসুল হক-এর নেতৃত্বে ৫৭ সদস্যের একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। '৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে।

এরকম একটি অবস্থায় ১৯৯৭ সালে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পূর্ণ সদস্যদের এক সভায় আমাদের দলের শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি আমরা বিষদভাবে তুলে ধরি। পরে তা 'শিক্ষানীতি ও শিক্ষাসংকট প্রসঙ্গে' নামে একটি খসড়া পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। ৪০ হাজারের উপরে বই বিক্রির মাধ্যমে আমাদের দল এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কর্মীরা সারা দেশে এ বক্তব্য সচেতন জনগণের কাছে নিয়ে যায়। তারপরই শিক্ষা সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষের সম্মতি নিয়ে একটা শিক্ষাআন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করার তাগিদ সৃষ্টি হয়। এদেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ, শিক্ষকসমাজ ও শিক্ষাবিদদের উপর আমাদের বিশ্বাস ছিল যে তারা জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনিই করবেন। একটি সর্বজনীন, সেক্যুলার, বিজ্ঞানভিত্তিক, গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তুলে ধরবেন। আমরা সেক্ষেত্রে আশানুরূপ সাড়া পেয়েছি। ফলে এ শিক্ষা সম্মেলন শিক্ষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথে মুক্তির সঠিক দিকনিশানাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে বলে আমরা আশা করি। এ শিক্ষা সম্মেলনকে তাই আমরা অভিহিত করতে চাই একটি New Education Renaissance Movement (শিক্ষার নবজাগরণ আন্দোলন) হিসেবে। শিক্ষার এই নবজাগরণ আন্দোলনে সারা দেশের শিক্ষাব্রতী গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল চেতনার সকল মানুষকে অংশগ্রহণ করার জন্য এ সম্মেলন থেকে আমি আহ্বান জানাই।

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে শিক্ষার সংকট ও শিক্ষাআন্দোলনের যে চিত্রটি আমরা বিজ্ঞ আলোচকদের কাছ থেকে পেলাম, তাও আমাদের শিক্ষাআন্দোলনকে অনেক সহায়তা করবে, শক্তি যোগাবে। এ শিক্ষা সম্মেলন আগামীতে জেলায় জেলায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্মেলনের সকল আলোচকের বক্তব্যসম্বলিত একটি 'শিক্ষা সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশেরও আমরা আশা রাখি। এক্ষেত্রে আপনাদের সর্বতো সাহায্য আমরা কামনা করি।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

'শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে' আমাদের খসড়া বক্তব্যকে আলোচনার সুবিধার্থে ১০টি আলাদা বিষয়ে ভাগ করে উপস্থিত করা হয়েছিল। এতে বিজ্ঞ আলোচকগণের কিছুটা অসুবিধার সম্মখীন হতে হয়েছে। কারণ প্রতিটি বিষয়ই পরম্পরায় যেমন সম্পর্কিত, তেমনি এক একটি বিষয়ের পরিধিও অনেক বিস্তৃত। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা এবং সামগ্রিকতায় বক্তব্য তুলে ধরার সীমাবদ্ধাতার জন্য আমরা বিজ্ঞ আলোচকদের অনেক জ্ঞানগর্ভ মতামত থেকে বঞ্চিত

হয়েছি। তারপরও অনেক সমালোচনা, প্রশংসা এবং পরামর্শসহ আমাদের ভাবনার কাছাকাছি একটা বড় ধরনের চিন্তাশক্তি ও কর্মদিশা পেয়ে আমরা যারপরনাই উৎসাহিত হয়েছি, যা ভবিষ্যৎ শিক্ষাআন্দোলনে একটা বড় প্রেরণা হয়ে থাকবে।

আমরা কি বলতে চেয়েছি? আমরা বলতে চাই, যে সমাজ কিংবা রাষ্ট্র মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবে রূপ দিতে অক্ষম, সেটা প্রকৃত স্বাধীন কিংবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে পারে না। আর মানুষকে স্বাধীন হতে হলে প্রকৃতির অন্ধ শক্তি, বিনাশী ক্ষতিকর শক্তি এবং সামাজিক সকল অনাচারী শক্তির প্রভাবমুক্ত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে বসবাস এবং জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে হয়। অন্যথায় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র তথা মুক্তিযুদ্ধের কিংবা স্বাধীনতাসংগ্রামের চেতনা ও যৌক্তিকতা সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

এতো জানা কথা যে, প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকারকে অস্বীকার করে যেমন নির্বাচনের কোনো মানে দাঁড়ায় না, তেমনি সকল নাগরিকের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, কাজ ইত্যাদি অস্বীকার করে গণতন্ত্র হয় না। অর্থাৎ সমাজ গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর দাঁড়াতে পারে না। সেজন্যই বলা হয়, আজকের দিনে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঁজিবাদ যতখানি প্রগতিশীল চরিত্রের ছিল, আজকের সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদ তার চেয়ে অধিকমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। তারপরও আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার দাবি তুলি নি। এককালের বুর্জোয়াশ্রেণীর গণতান্ত্রিক অঙ্গীকারের কথাই বলছি। এখন প্রশ্ন হলো-জুতার মাপে পা হবে, নাকি পায়ের মাপে জুতা হবে। অর্থাৎ জনগণের স্বচ্ছন্দ জীবনবিকাশের উপযোগী সমাজ হবে, নাকি অধিকার খর্বকারী সমাজব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে মাথা খুঁড়ে মরতে হবে? আমরা জীবনের দাবি, মনুষ্যত্বের দাবি, মৌলিক মানবিক গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি এবং ন্যায্যতার কথা বলছি। যদি প্রচলিত সমাজ তাকে ধারণ করতে পারে, ভালো; আর না পারলে এই ব্যবস্থা ভেঙে জীবনধারণ উপযোগী ব্যবস্থা নির্মাণের পথে এগুতে হবে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। শিক্ষাআন্দোলনের মর্মবস্তুগত বিষয়টিকে এইদিক থেকে বুঝলে ঠিক বুঝা হবে বলে আমরা মনে করি।

জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারকে কোন অজুহাতেই অস্বীকার করে কিংবা পাশ কাটিয়ে গণশাসন হয় না, হতে পারে না। সেজন্য জনপ্রতিনিধিত্বের দাবিতে কেউ জনগণের ভোট নিয়েছে মানে জনগণের আকাঙ্ক্ষা, দাবি ও চাহিদা পূরণের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে; জনগণের মিলিত ইচ্ছার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছে। এ জাতীয় ভাবনায় গণতান্ত্রিক ভাবমানস কিছুটা ফুটে উঠে। আমাদের দেশের চিত্র যদিও এর বিপরীত। বৃটিশ কিংবা পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলে শাসকরা গণদাবি বাস্তবায়নে অপারগতার নানা যুক্তি হাজির করতো। একই যুক্তি যদি এখনও শাসকগোষ্ঠী হাজির করে, তাহলে স্বাধীন দেশে তাদের শাসনকার্য পরিচালনার কোন নৈতিকতা কিংবা ন্যায্যতা থাকে কি? থাকে না। অথচ আমরা দেখছি পাকিস্তান আমলের কথাগুলি এখন আবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা হচ্ছে। যেমন, 'টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনতে হবে', 'রাষ্ট্রের পক্ষে শিক্ষার পুরো আর্থিক দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়', 'সবার জন্য বাধাহীন শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের কিছু করার থাকবে না', একমুখী শিক্ষা নয়, সামাজিক শ্রেণীভেদ টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই কমপক্ষে 'তিন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি থাকবে', সর্বজনীন বাধাহীন শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদের সার্বিক উন্নয়নের বদলে 'অসম প্রতিযোগিতার বাছাই করা শিক্ষা'-এই নীতিতে শিক্ষার সংকোচন ও সম্প্রসারণ করা হবে, 'বৈষয়িক উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের কারিগরি দিক আর নৈতিকতার জন্য ধর্মশিক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক শিক্ষার মিলন ঘটিয়ে সিলেবাস তৈরি করা হবে' ইত্যাদি। এখনও সেগুলিই বলা হচ্ছে এবং কার্যকর করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বচনের এবং প্রয়োগের মাত্রাগত কিছু তারতম্য ছাড়া মৌলিক পার্থক্য তেমন কিছুই নেই। তাহলে অতীতের ঔপনিবেশিক শাসন যে-কারণে ছাত্র-জনতার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি, একই কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠলে আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকেও ছাত্র-জনতা কিভাবে এবং কেন মেনে নেবে? শিক্ষার দাবিতে চলমান আন্দোলন ছাত্র-জনতাকে সে প্রশ্নেরই মীমাংসার কাছাকাছি নিয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের শাসকগোষ্ঠী সংবিধান লঙ্ঘন করে দেশ শাসন করে এসেছে; শিক্ষানীতির কথাও বলছে। এমনিতেই বেসামারিক-সামরিক একনায়কদের কলম ও বেয়নেটের খোঁচায় সংবিধান ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একটা গোঁজামিলের দলিলে পরিণত হয়ে আছে। তারপরও সংবিধানের ১৭ (৩) অনুচ্ছেদে একমুখী শিক্ষার কথা বলা আছে। অথচ বর্তমান প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে তা উপেক্ষা করে তিন ধারার শিক্ষার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর জবাব কি? অথচ এদের কাছেই আমাদের শুনতে হবে সাংবিধানিক শাসন, আইনের শাসন ইত্যাদি কথা।

সকল নাগরিকের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের সমতার কথা বলেই সরকারি মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রপ্রতি বার্ষিক ব্যয় যেখানে হচ্ছে ৩,২১২ টাকা, বেসরকারি খাতে ৯৬৯ টাকা। আর অন্যদিকে সরকারি মাদ্রাসা খাতে তার পরিমাণ ৬,৩৩৮ টাকা, ক্যাডেট কলেজে ৪৭,৫২৫ টাকা অর্থাৎ বেসরকারি মাধ্যমিকের চেয়ে প্রায় ৫০ গুণ বেশি। তাহলে অধিকার এবং সুযোগের সমতা বলে কিছু থাকলো কি? এগুলোর জবাবদিহিতা তো দূরের কথা, শাসক দলের এ বিষয়ে ভাবনার অবকাশই বা কতটুকু! শিক্ষার নীতিগত প্রশ্নে এটা শ্রেণী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত স্বেচ্ছাচার ছাড়া আর কি হতে পারে?

একথা অনেকে স্বীকার করেন যে, খাওয়ার অভাবে মানুষের শারীরিক মৃত্যু ঘটে আর শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাবে ঘটে মানসিক মৃত্যু। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে দেহে-মনে পঙ্গুত্ববরণ এবং মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে কি করে যে জাতীয় উন্নতি, অগ্রগতি সম্ভব তা তারাই শুধু বলতে পারেন। ৫০ হাজার গ্রামে এখনো সরকারি প্রাইমারী বিদ্যালয় নেই। আমরা বলেছি, দুইশত পরিবারের সন্তানদের পড়ার জন্য কমপক্ষে একটি সরকারি প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন করা এই মুহূর্তে জরুরি। সে হিসেবে প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ন্যূনতম ১,২০,০০টি। বর্তমানে রয়েছে মাত্র ৩৭,৭১০টি। এখন কথা হলো, পাঁচশত কোটি টাকা খরচ করে নৌ-বাহিনীর ফ্রিগেট কেনা দরকার, না প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন করা জরুরি? ক্যান্টনমেন্টের পর ক্যান্টনমেন্ট, এমনকি বাজেট বহির্ভূত প্রধানমন্ত্রীর বিশেষবরাদ্দ দিয়ে হলেও ক্যান্টেমেন্টের প্রয়োজন, না জরুরিভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দরকার? স্বাধীনতার পর শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল রাজস্ব ব্যয়ের ২১.১৪ ভাগ। এখন তা ১৮ ভাগের নিচে। অন্যদিকে প্রতিরক্ষাখাতে ছিল ৯ ভাগ, এখন তা বেড়ে ২১ ভাগের উপরে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় শিক্ষা-বিস্তারে শাসকগোষ্ঠী কতটা আন্তরিক। শুধু কি তাই, প্রথম শ্রেণীতে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ে। আমরা বলেছিলাম-৭০ ভাগ মানুষ যেখানে ভূমিহীন, ৫০ ভাগের উপর মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে, সেখানে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ঘোষণা দিয়ে ফল হবে না। তাই প্রাইমারী স্কুলের সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা-উপকরণ ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার, নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা এবং বছরে দুই জোড়া স্কুল ইউনিফর্ম বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। তাহলে ড্রপ-আউট কিছুটা কমবে। আর ড্রপ-আউট সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই ড্রপ-আউট ঘটাতে হবে। যাক, এখন কথা হলো-প্রধানমন্ত্রীর অফিস খরচ গত অর্থবছরের ১৩৭ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা থেকে এ অর্থবছরে ২৮০ কোটি ১৩ লাখ টাকা বাড়ানো দরকার, নাকি প্রাইমারী ছাত্র-ছাত্রীদের খাবার সরবরাহ দরকার? এ বিষয়গুলোতে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। তা হলো, প্রাইমারীতে যাওয়ার পূর্বের অবস্থা প্রাইমারীর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময়টাতে শরীর এবং মনের যে কাঠামোগত ভিত্তি গড়ে উঠে, তা সমগ্র জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ সময়ের অবহেলা এবং ঘাটতি সারা জীবনে পূর্ণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সেজন্যই আমরা বলেছি-প্রতিটি প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সাথে প্রি-প্রাইমারী স্কুল, অনেকটা নার্সারী বা চাইল্ড কেয়ার সেন্টার-এর মতো করে রাখতে হবে। অতিদরিদ্র এবং ভগ্নপরিবারের ২ থেকে ৫ বছরের সন্তানদের দিবা-রাত্রি যত্নের সকল ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে করতে হবে।

আপনারা জানেন যে মানুষের জীবন বিকাশের ধাপগুলো একই প্রবাহে চলে না। যেমন: শিশুকাল (০-৬), কৈশোর (৬-১৩), তারুণ্য (১৩-২৫), যৌবনকাল (২৫-৪৫), পৌঢ়ত্ব (৪৫-৬৫) এবং বার্ধক্য (৬৫ থেকে তদুর্ধ্ব)। এসময়ে মানুষের কর্মশক্তি, চিন্তাশক্তি, দক্ষতা, আবেগ-অনুভূতি, স্মরণশক্তি, শরীরের ক্ষয়-বর্ধন, অনুকরণ-প্রবণতা, জিজ্ঞাসা, ঔৎসুক্য, চঞ্চলতা, ধী-শক্তি, গ্রহণ-বর্জন-সৃজন ক্ষমতা ইত্যাদি এক রকম থাকে না। ফলে মানুষ হয়ে ওঠার জীবনভর কর্ম-শিক্ষা-সাধনার গতি-প্রকৃতি যেমন এক নয়, তেমনি রয়েছে বহু বিচিত্র সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্যের দ্যোতনা। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচনার বাইরে রাখলে চলে না। বিশেষ করে শিশুকাল, যেখান থেকে মানবজীবনের ভিত্তি নির্মাণ হয়; তাকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যার আওতায় না এনে শুধুই পরিবারের গন্ডির মধ্যে রেখে দিলে জীবন নির্মাণের জটিল-কঠিন-দুরূহ কাজটি আজকের দিনে পূর্ণরূপে সম্পাদিত হতে পারে না। কারণ, একটা রকেটকে চাঁদ অভিমুখে ছুঁড়ে দেবার আয়োজনের চেয়ে একটি শিশুকে জীবনের ঊর্ধ্বমুখে প্রবাহিত করার আয়োজন এবং যত্ন অনেক বেশি সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিচর্যার দাবি রাখে।

সুইজারল্যান্ডের শিক্ষাবিদ হাইনরিক্ পেস্তালাৎসি (১৭৪৬ - ১৮২৭) অসহায়-অনাথ-এতিম শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করতে গিয়ে প্রথম অনুভব করেন যে প্রত্যেকটি শিশুই স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশ সম্ভাবনায় উন্মুখ, যা সনাতনী পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তাঁর অনুসারী জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রেডারিখ ফ্রেরাবেল (১৭৪২ - ১৮৫২) শিশুর এই স্বতন্ত্র-স্বাধীন বিকাশের উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন হিসেবে বিশেষধরনের বিদ্যালয় 'কিন্ডারগার্টেন' বা

'শিশু কানন' প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শরীরের পুষ্টি ও মনের তুষ্টি সহকারে শিশুদের সহজাত প্রবণতাগুলোকে আগ্রহ, উদ্দীপনা, কৌতুহলের সাথে স্বাধীন আনন্দধারায়, প্রীতিময় পরিবেশে সজীব ও পুষ্ট করতে করতে তাদের শিক্ষিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু আজ আমাদের দেশে কিন্ডারগার্টেন নামের প্রতিষ্ঠানগুলোকে দাঁড় করানো হয়েছে শিশুশিক্ষার বাণিজ্যমেলা রূপে। এখানে দেশের কোমলমতি শিশুদের দেশের মাটি ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয় অঢেল টাকার শিক্ষা কেনার প্রবণতার মাঝে। ঢাকাতেই এ ধরনের স্কুল আছে যেখানে একটি শিশুর মাসিক বেতন ২০ হাজার টাকা। অন্যান্য খরচ তো আছেই। এইভাবে দুই-তিনশ' টাকা থেকে শুরু করে হাজার হাজার টাকা বেতনের অসংখ্য কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। এর পরবর্তী ধাপ ও-লেভেল/এ-লেভেল ইত্যাদি কোর্সে বাংলা ভাষা, বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদির পাঠ তেমন নেই। এরা আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ইতিহাস যতটা জানে, ৫২'র ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তার কণামাত্র জানে না। এইভাবে দেশপ্রেমবর্জিত একটা উগ্র-আধুনিকতায় এরা বেড়ে উঠছে। আর তার বিপরীতে দেশের ৭০ ভাগ গরীব মানুষের সন্তানেরা বাল্যকাল থেকেই বেড়ে উঠছে অবহেলা আর অযত্নে, অনাহার-অপুষ্টিতে, কূপমন্ডূক-কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে। এদের সামনে অন্ধকার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। এমনি করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দুই অংশ বেড়ে উঠছে দুই বিপরীতমুখী ধারায়। এদের রক্ষা করতে না পারলে, কালের স্রোতে আমাদের সভ্যতার দাবি টিকবে কোন যুক্তিতে? তাই ২ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত বয়সকালের সকল শিশুর জন্য প্রত্যেকটি প্রাইমারী স্কুলসংলগ্ন প্রি-প্রাইমারী ধরনের প্রতিষ্ঠানের আয়োজন থাকা দরকার। এ শিশুদের রাষ্ট্রীয় পরিচর্যায় খাদ্য, পোষাক, খেলনা, শিক্ষার অন্যান্য উপকরণসহ স্বাস্থ্যসুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

দুর্নীতি এবং অপচয়ে দেশের যে-পরিমাণ টাকা প্রতিদিন লোপাট হয় তার অর্ধেকও এখানে আনতে পারলে এ ব্যবস্থাপনা দাঁড় করানো সম্ভব ছিল। যদিও আমরা জানি, তা হবার নয়। কিন্তু এটা জনসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে যে কি বিপুল শক্তি যোগাতো, তা সাধারণ আয়-ব্যয়ের হিসাব দিয়ে বোঝা যাবে না। একটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের ক্ষেত্রে এ দিকটির প্রতি সচেতনতা যে কতটা অপরিহার্য তা এখনো আমরা ঘরে ঘরে সৃষ্টি করতে পারি নি। এখানেই শোষকশ্রেণীর দায় এড়ানোর জায়গাটা তৈরি হয়ে আছে।

আরো একটি বিষয় এখানে লক্ষ করার মতো। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালগুলোতে মাত্র ১০ টাকা দিয়ে শিক্ষা পাওয়া যায়-এ ধরনের একটা প্রতারণাপূর্ণ কথাকে সামনে রেখে ছাত্র বেতন-ফি ইত্যাদি বাড়ানোর চেষ্টা শাসকদলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় করা হচ্ছে। সচেতন ও সাধারণ ছাত্রসমাজের আন্দোলনের মুখে সরকারি এ প্রচেষ্টা কখনো ব্যর্থ হচ্ছে, আবার কার্যকর আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে কখনো তা সফল হচ্ছে। এখন কথা হলো, আসলেই কি ১০/২০ টাকা দিয়ে উচ্চশিক্ষা পাওয়া সম্ভব?

জন্মের পর থেকে একজন ছাত্র বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় রাষ্ট্র যতটুকু আর্থিক দায়িত্ব নেয়-তার চেয়ে ২০/২৫ গুণ শিক্ষার্থীকেই বহন করতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে একজন ছাত্র কোথায় ভর্তি হতে পারবে এবং কোন বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারবে-এর কোনটাই শিক্ষার্থীর পছন্দ বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ফলে ভর্তি কোচিং, বিভিন্ন স্থানে ভর্তি পরীক্ষার হয়রানি এবং যাতায়াত-থাকা-খাওয়া ইত্যাদি মিলে কয়েক হাজার টাকা ভর্তির আগেই খরচ হয়ে যায়। তারপর ভর্তির সুযোগ পেলে বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন রকম ভর্তি-ফি ও চার্জ বাবদ আরো কয়েক হাজার টাকা লাগে। বিভিন্ন শিক্ষা উপরকণ, বই-পত্র, থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা, যাতায়াত ব্যয়-এভাবে সব মিলিয়ে ৩০ থেকে ৭০ হাজার টাকা প্রতি বছরই লেগে যায়। আমাদের দেশের ৭০ ভাগ ভূমিহীন পরিবারের সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার প্রশ্নই উঠেনা। একজন মাঝারী স্বচ্ছল কৃষকের পক্ষেও এখন বছরে ২০ হাজার টাকা উদ্ধৃত্ত করা সম্ভব হয় না। অথচ একজন শিক্ষার্থীর হল-হোষ্টেলে থাকা খাওয়া বাবদ যদি প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা যোগান দিতে হয়, তাহলে বছরে প্রয়োজন চব্বিশ হাজার টাকা। বাকি সন্তান-সন্ততির খরচ, আবাদখরচ, সাংসারিক খরচ, এগুলোতো আছেই। ফলে, দশ টাকা ছাত্র বেতনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ছাত্র-প্রতি হাজার হাজার টাকার সরকারি দায়িত্ব অস্বীকার করে চলার একটা চমৎকার বাহানা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। অনেক সৎ মানুষও এ ধরনের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

অনেকে আবার এমন পরামর্শও দেন যে, ধনী ছাত্রদের কাছে বেশি বেতন নিতে অসুবিধা কোথায়? তারা বিদেশে লক্ষ টাকা খরচ করে পড়তে পারে, তো দেশে কয়েকশ' টাকা বেতন দিলে ক্ষতি কি? এখানে যে-বিষয়টি খেয়াল করা হয় না তা হলো, একজন শিক্ষার্থীকে ধনী-দরিদ্র ক্যাটাগরিতে ফেলা ঠিক নয়। ধনী কিংবা গরিব শিক্ষার্থী নয়, তাদের অভিভাবক। এখন কথা হলো, বিত্তশালীদের কাছ থেকে অধিক মাত্রায় ট্যাক্স নিলেই তো এ সমস্যা লাঘব

হয়। কিন্তু অর্থমন্ত্রীরা যখন বলেন, দেশের প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ২০০টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আয়কর দেয় না এবং ফাঁকি দেয়, ১৮১ জন সাংসদ আয়কর দেন না, ৫০০ কোটি টাকার ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে ৬০০ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী কাপড় আমদানী করে, ১১৩ জন পুলিশ কর্মকর্তার ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে, ইত্যাদি-সেদিকে কারো নজর নেই। ৬০ হাজার উচ্চশিক্ষার্থীর কাছ থেকে মাসে এক হাজার টাকা করে বেতন নিলেও বছরে দাঁড়ায় মাত্র বাহাত্তর কোটি টাকা। অথচ বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে সহজেই কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকা আয়কর আদায় করা যায়। কিন্তু, এই লুটপাটের জায়গায় হাত না দিয়ে ধনী-ছাত্রের দোহাই পেড়ে বেতন-ফি বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। আর এভাবেই তা এক পর্যায়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর চেপে বসবে, যা তাদের শিক্ষাজীবনকে করে তুলবে দুঃসাধ্য। এই প্রক্রিয়ায় উচ্চশিক্ষার দুয়ার থেকে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীকে বিতাড়িত করাই এদের আসল উদ্দেশ্য। এ কথাটা বুঝতে হবে।

শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দানের বিষয়টির সাথে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সরকারি দফতরের একটি ফাইল অপারেশন কিংবা একটি যন্ত্র নির্মাণে যত ত্রুটিই হোক না কেন, তার ক্ষতি-আর একজন মানুষের জীবনবিকাশের সঠিক গতিমুখ ভ্রষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতি-এ দুটোর কোন তুলনাই হয় না। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। এখানো পর্যন্ত মানুষকে মানুষ হিসেবে নির্মাণের কাজটি জগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টিশীল শিল্প এবং সর্বোচ্চ দায়িত্ব-কর্তব্যবোধের কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, প্রকৃত যোগ্য মানুষ নির্মাণের উপরেই বাস্তবে অপর সকল নির্মাণ সাফল্য-সম্ভাবনা নির্ভর করে আছে। তাই আমরা বলেছি, শিক্ষকদের বেতন কাঠামোকে সর্বোচ্চ গ্রেড থেকে শুরু করে স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। শিক্ষকদের যোগ্যতার প্রশ্নটি এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই এসে যাবে। আমরা বলেছি-বর্তমানে যারা শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত রয়েছেন, তারা মানে-দক্ষতায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও দীর্ঘকালের সরকারি চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্যের মাঝে তারাই সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে যতটুকু শিক্ষাকাঠামো এখনো আছে, তাকে টিকিয়ে রেখেছেন। এই সকল শিক্ষকদের যোগ্য করে তোলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আগামী দিনে শিক্ষকদের যোগ্যতার প্রশ্নে দেশপ্রেম, সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি, মেধা-মনন, প্রজ্ঞা, জ্ঞান সাধনা এবং শিক্ষাদান ক্ষমতা বিবেচনায় রাখতে হবে। মেধা-মনুষ্যত্বসহ সবচেয়ে এগিয়ে থাকা মানুষেরাই হবেন শিক্ষক। বিদ্যাসাগর, বেগম রেকেয়া, মাষ্টারদা, জগদীশ চন্দ্র বসু, সামছুজ্জোহা, জি. সি. দেব, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতো আদর্শ শিক্ষকদের কথা এক্ষেত্রে আমাদের খেয়ালে এবং প্রেরণায় রাখতে হবে।

আরেকটি বিষয়ের উপর বড় ধরনের বিভ্রান্তির ছায়া পড়ে আছে। সেটা হলো ছাত্ররাজনীতি প্রসঙ্গ। রাজনীতি সম্পর্কিত ধারণাকে যেখানে নামানো হয়েছে, তাতে ছাত্ররাজনীতি থাকলো কি থাকলো না তার চেয়েও বড় ভাবনার বিষয় ৬৩ ভাগ নিরক্ষরের দেশে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যেও যদি রাজনীতি সম্পর্কে ভ্রান্তি বিরাজ করে তাহলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ কি? কারণ, দেশের শাসনব্যবস্থা, উৎপাদন ও বিলিবন্টন ব্যবস্থা কোন নীতি এবং আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করার দর্শন এবং বিজ্ঞান হচ্ছে রাজনীতি। ভিন্ন নাম সমাজসচেতনতা। তারপরও আমাদের বিচারধারা গুলিয়ে যাচ্ছে কেন? পাকিস্তান আমলে আইয়ুবের পেটোয়া বাহিনী হিসেবে গড়ে ওঠা ছাত্র সংগঠন এন.এস.এফ.-এর কর্মীরা যখন সন্ত্রাস করতো, তখন কেউ ছাত্ররাজনীতি বন্ধের কথা বলে নি। বরং, আইয়ুব খানদের রাজনীতিকে মোকাবেলা করার জন্যই ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী চেতনা-সমৃদ্ধ বিকল্প ছাত্ররাজনীতিকে সবাই উৎসাহ যুগিয়েছে।

আজকেও আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা যখন সন্ত্রাস করে, তখনই সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে-এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ছাত্ররাজনীতি বন্ধতো নয়ই, বরং শোষণমুক্তির চেতনা-সমৃদ্ধ উচ্চতর সংস্কৃতির ভিতের উপর সুগঠিত ছাত্ররাজনীতিকে, ছাত্র-যুবশক্তিকে সকল দিক থেকে সহযোগিতা করে বাড়িয়ে তুলতে হবে। শুধু তাই নয়, ঐসকল সংগঠনের সাথে যুক্ত কোমলমতি, নির্দোষ অথচ বিভ্রান্ত ছাত্র-যুবশক্তিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও সবাইকে নিতে হবে। অথচ তা না করে আমরা শাসকদের প্রতারণা এবং প্রচারণার ফাঁদের জড়িয়ে পড়েছি। নইলে গ্রাম্য কোন্দলকে 'ভিলেজ ক্লিক' না বলে আমরা বলছি 'ভিলেজ পলিটিক্স'! শিক্ষকদের সংকীর্ণ দলাদলিকে 'টিচার্স গ্রুপিং' না বলে আমরা বলছি 'টিচার্স পলিটিক্স'! সঠিক ছাত্ররাজনীতি যে ছাত্রসমাজের মাঝে কতোটা সামাজিক দায়িত্ব, দেশপ্রেম এবং সুরুচির মান দাঁড় করাতে পারে; তা-তো এই সম্মেলনের মধ্য দিয়েই ছাত্র ফ্রন্ট তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন এবং বলেছেনও।

দলীয় লেজুড়বৃত্তির কথাও অনেকে বলে থাকেন। এখানেও একই কথা খাটে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দল মানেই কোনো না কোনো শ্রেণীর দল। ফলে এ যুগে বুর্জোয়াশ্রেণীর দল মানেই একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। এ ধরনের একটি দল প্রধানতঃ কায়েমী স্বার্থের রক্ষক ও পরিচালক হয়ে থাকে। ফলে তাদের অনুসারী ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী যে-ই হোক, তার মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার মনোবীজ বাসা বাঁধে। বুর্জোয়া দলগুলি মানুষকে নিচে না নামিয়ে তাদের নিচু-স্বার্থ, হীন-উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না বিধায় তাদের সাথে যুক্ত সৎ মানুষদের মধ্যেও তাই অসৎ প্রবণতাগুলি দিনে-দিনে বাড়তে থাকে, অবক্ষয়ের ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। অন্যদিকে একটি প্রগতিশীল দল, বিপ্লবী দল সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর স্বার্থ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে গড়ে উঠে। সমাজ-সভ্যতা বিকাশের সাথে সংগতিপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠার কারণে এ ধরনের দলের সাথে সম্পৃক্তি অসভ্য মানুষকেও সভ্য করে তোলে। মানুষ মনুষ্যত্বের সন্ধান পায়। তারা জনগণের সংগ্রাম সংগঠিত করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন প্রতিরোধের শক্তি নির্মাণ করে, তেমনি সংগঠিত জনতার সংগ্রামী শক্তির সজীব ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষাকেও মূর্ত করে তোলে। দেশের সামনে, দশের সামনে আশার আলো জ্বালে। এদের সংস্পর্শে এসে সাধারণ মানুষও বাঁচার স্বপ্নকে জীবন্ত করে তুলতে পারে, আস্থা-ভরসা পায়। আজ তাই নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং ছাত্র-যুবসম্প্রদায়কে আদর্শবাদী রাজনীতির প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

এবার প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে কিছু বলি। শামসুল হকের নেতৃত্বাধীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে তাই সম্ভবতঃ কিছু এদিক ওদিক করে পাশ হবে। কিন্তু এই শিক্ষানীতিতেও প্রতারণামূলক বক্তব্যের আশ্রয় নিয়ে বাস্তবে শিক্ষার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকিকরণ এবং শিক্ষার সংকোচনকেই ত্বরান্বিত করা হবে। কারণ রিপোর্টে একদিকে বলা হচ্ছে, 'দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করা হবে', এবং পরিসংখ্যান দিয়ে বলা হয়েছে যে ১০ ভাগ শিশু প্রাইমারী বিদ্যালয়ে যায় না এবং ৪০ ভাগ প্রাইমারি শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। অর্থাৎ ৫০ ভাগ শিশু প্রাইমারী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এখন, কমিটি এ শিক্ষা না পাওয়ার নানাবিধ কারণ, যেমন 'ভৌত সুযোগ-সুবিধাদি, শিক্ষকস্বল্পতা, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা' ইত্যাদি কথা বলেই সমাধানের জায়গায় এসে বলছে, "... আমাদের দেশে অনেককে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কর্মজীবন আরম্ভ করতে হয়, আবার অনেকে পরবর্তী শিক্ষাস্তরে প্রবেশ করে। এই দুই ধরনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা দরকার।" ফলে কি দাঁড়ালো? ৫০ ভাগ শিশুকে শিক্ষার আওতার বাইরে রাখার কথা 'মনে রেখে' শুধু নয়, মেনে নিয়েই তো বাস্তবে শিক্ষানীতি প্রণীত হতে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের আর্থিক দায়িত্বের কথাও বলা হয়েছে এইভাবে, "কিন্তু এ দায়িত্ব এমন বিশাল যে দেশের সকল নাগরিক এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা ব্যতিত রাষ্ট্রের পক্ষে এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা দুঃসাধ্য।" ফলে শিক্ষার ব্যয়ভার রাষ্ট্রের উপর থেকে নামিয়ে শিক্ষার্থীদের উপরেই যে চাপানো হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীকে পিষ্ট করে শিক্ষাঙ্গন থেকে বিদায় করা হবে-এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাফাই গেয়ে বলা হচ্ছে, "জাতীয় দক্ষতামান তিন, দুই ও এক পর্যায়ের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাক্রমে (মাদ্রাসা শিক্ষাসহ) পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক করতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বর্ধিত হারে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্পকারখানা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে স্যান্ডুইচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাস্টার ক্রাফটস্‌ম্যান সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।" জাতীয় দক্ষতামান তিন, দুই ও এক পর্যায়ের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি মানে গরীব মধ্যবিত্ত জনগণের শিক্ষা এবং মূলধারার মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা ইত্যাদি শিক্ষাকে জুগালী, মিস্ত্রী, স্পিরিচুয়াল প্রোপাগেটর আই.টি প্রোগ্রামার পর্যন্ত সীমিত রাখা হবে। আর কিন্ডারগার্টেন, ও-লেভেল/এ-লেভেল, ক্যাডেট, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য ইত্যাদি দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিত্তশালী পরিবারের সন্তানরাই উচ্চশিক্ষা লাভের সুবর্ণ সুযোগ পাবে। তারা হবে ভবিষ্যতের শাসক-প্রশাসক। এইভাবে সাধারণ মানুষের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ করার প্রস্তাবই বাস্তবে করা হয়েছে।

কথায় কথায় আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি এবং চেতনার কথা বলে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিসমূহের সাথে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বুর্জোয়া দলসমূহের শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোন পার্থক্য নেই। জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযম শিক্ষানীতি প্রশ্নে তাদের পার্টি পুস্তিকায় বলেছেন, "আমরা দীর্ঘ কোর্সের ব্যয়বহুল এম.বি.বি.এস ডাক্তার দিয়ে ৯ কোটি মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন ১৫০ বছরেও পূরণ করতে পারব না। এর জন্য গ্রামে থাকতে রাজী স্বল্প-মেয়াদী কোর্সের বিরাট চিকিৎসক বাহিনী সৃষ্টি করতে হবে। হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে অল্প খরচে এ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। জাতীয় সম্পদের বিরাট অংশ ব্যয় করে আমরা দামী ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করছি। অথচ তাদেরকে কাজ

দিতে পারি না বলে তারা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।" "কিশোর ও যুবকদের হাতকে উৎপাদনের যোগ্য বানাবার জন্য সংক্ষিপ্ত টেকনিকেল শিক্ষা ব্যাপক না করায় শিক্ষা দ্বারা বেকারের মিছিলকে বৃদ্ধিই করা হচ্ছে।" "কি করে দেশের সব হাতে কাজ তুলে দেয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে দেশের সব নারী-পুরুষকে বিভিন্ন কুটির শিল্পে শিক্ষা দিয়ে উৎপাদনী জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। আমাদের গরীব দেশের সম্পদ কি করে বাড়ান যায় সে শিক্ষার জন্য কলেজের মতো দালান, এমনকি হাই স্কুলের মতো ঘর না হলেও চলতে পারে। পশু পালন, হাস-মুরগী বৃদ্ধি, মাছের সস্তা চাষ, ফল-মূল শাক-শব্জি উৎপাদনের জ্ঞান নিরক্ষর লোকদের মধ্যেও বিতরণ করা সম্ভব। শিক্ষা বলতে শুধু স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই বোঝায় না। গণশিক্ষার জন্য মসজিদ, মক্তব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোই ব্যবহার করা যেতে পারে।" এইভাবে ধর্মের নামে শিক্ষার ইসলামীকরণের নামে এই সকল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সুকৌশলে শিক্ষা সংকোচনের নীলনক্সা হাজির করে। পুঁজিবাদ যে বেকার সৃষ্টি করে এই সত্য আড়াল করে তা শিক্ষার উপর চাপিয়ে দেয়। কিশোর এবং যুবকসহ দেশের সব হাতে কাজ দেয়ার নাম করে সংক্ষিপ্ত টেকনিক্যাল শিক্ষার ধুয়া তুলে এরা বাধামুক্ত সর্বজনীন শিক্ষার বিরোধীতা করে। শাসকশ্রেণীকে শিক্ষার দায়মুক্ত করার প্রয়াস চালায়। এরা একদিকে বলছে স্কু-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দালানেরও প্রয়োজন নেই, আবার বড় বড় ইমারত ঘেরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির গড়ে তুলছেন। কথা ও কাজের এই অসঙ্গতি নিয়ে চলা এবং ধর্মের নামে পুঁজিবাদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাজ করার জন্যই এদের নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী ছাত্র শিবির একটা সন্ত্রাসী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। উপরোক্ত বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথা পরিষ্কার যে শিক্ষা সংকোচন প্রশ্নে কথিত জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয় মৌলবাদী সকল বুর্জোয়া দলই এক সমান্তরালে দাঁড়িয়ে আছে।

এখন শিক্ষার ইসলামীকরণ, হিন্দুত্বীকরণ, খৃষ্টিয়করণ ইত্যাদি উদ্যোগ নানাভাবে বিভিন্ন দেশে চলছে। ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি হিন্দুয়ানী শিক্ষায় ভারতবাসীকে শিক্ষিত করার ধুয়া তুলে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টি করে ক্ষমতা মজবুত করতে চাইছে। পাকিস্তান আমলের শাসকরাও ইসলামীকরণের নামে একই কাজ করেছে। ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বলা হয়েছিল,

"১. কোরান ও সুন্নার আদর্শে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে মুসলমানদের জীবন গঠনে সহায়তার জন্য রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ২. রাষ্ট্র এমন সুযোগ সৃষ্টি করবে যাতে মুসলমানগণ পবিত্র কোরান ও সুন্নার আলোকে জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। ৩. পবিত্র কোরান বাধ্যতামূলকভাবে মুসলমানদের শিক্ষা দেয়া হবে। ৪. মুসলমানদের মনে ইসলামের নৈতিক আদর্শ ও একাত্ববোধের ধারণা বিকাশ করতে হবে।"

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কথিত ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন এবং এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "ধর্ম বিশ্বাসের অভাবে মানুষের সব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।" সেদিনের কথিত ধর্ম শিক্ষার ফল যে কি দাঁড়িয়েছিল তা ১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে জীবন দিয়ে বুঝে নিতে হয়েছিল। কিন্তু আজও কি এ অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেছে ?

শামসুল হকের শিক্ষানীতি প্রস্তাবনার মধ্যেও নৈতিক উন্নতির জন্য কথিত ধর্মশিক্ষার নানা প্রস্তাবনা হাজির করা হয়েছে। যদিও বিত্তশালীদের জন্য এগুলো পালনীয় নয়। তারা সাহেবীয়ানায় মানুষ হবে, আর সাধারণ মানুষদেরকে কুসংস্কার আর গোঁড়ামীর শক্ত খুঁটিতে বেঁধে রেখে শাসকগোষ্ঠী তাদের উপর শাসন-শোষণ চালিয়ে যাবে।

দীর্ঘদিন ধরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি পাল্লা দিয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার পরিণতিতে শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের ঝোঁক এখন কতটা অন্তঃসারশূন্য বাচাল উগ্রতা নিয়ে হাজির হয়েছে তা বোঝা যাবে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ১৯৯৭ সালের জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সংকলনে প্রকাশিত প্রফেসর তাজুল ইসলামের 'বর্তমান অবস্থায় কৃষি শিক্ষার ইসলামীকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধের কথা থেকে। তিনি বলছেন, "কোন কিছু ইসলামীকরণ অর্থে আমরা সাধারণতঃ বুঝি ইসলামী মূল্যবোধ বা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে সে বিষয়ের পুনর্বিন্যাস ও বাস্তবায়ন। সে অর্থে কৃষি শিক্ষা ইসলামীকরণ অর্থে আমরা বুঝি বর্তমান কৃষি শিক্ষাকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানো। অর্থাৎ কোরান ও হাদীসের আলোকে কৃষি শিক্ষার দিক দর্শন তথা উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নির্ণয় করা এবং সে অনুসারে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা। .... কৃষির অপর অনুষদ মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ। উক্ত অনুষদের শিক্ষার্থীকে ফিসারিজ বায়োলজি ও লিমানোলজি, একুইকালচার ও ম্যানেজমেন্ট, ফিসারিজ টেকনোলজি, গণিত, রসায়ন,

প্রাণরসায়ন, গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান, কৃষি পরিসংখ্যান, মাইক্রোবায়োলজি, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বা কৃষি অর্থনীতি বিভাগে অধ্যয়ন করতে হবে।

এ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের বা গ্রহণের সময়ে যে সমস্ত বিষয়ে সরাসরি ইসলামের সঙ্গে সংঘর্ষ আসে তা হলো বিবর্তনবাদ, ম্যালথেসিয়ান থিউরি, অর্থনৈতিক মতবাদ বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক মতবাদ ও প্রাণের উৎস বা জেনেসিস। এ কয়েকটি বিষয়ে প্রায় সব ছাত্রছাত্রীকে অধ্যয়ন করতে হয়। অথচ সেখানে এসব ব্যাপারে ইসলামী মতবাদ বা কোরান হাদীসের নির্দেশ সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হয় না।" ফলে তার সুপারিশ হচ্ছে, "১। কৃষি কৃষ্টির মূল। ইসলাম কৃষককে সম্মানিত ব্যক্তি এবং কৃষিকে মহাপুণ্যের কাজ বলে আখ্যা দিয়েছে। এই ভাবধারা সমাজের আপামর জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়াই হবে কৃষি শিক্ষার ইসলামীকরণের প্রধান দায়িত্ব।...৮। পবিত্র কোরানের সুরা আর-রাহমানে উল্লেখ আছে যে, গাছপালাও আল্লার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং তাকে সিজদা করে। গাছপালা যে জীবিত তা বহু পূর্বেই কোরানে উল্লেখ আছে। অবশ্য বিজ্ঞান বহু পরে আবিষ্কার করেছে যে, গাছেরও প্রাণ আছে। বিজ্ঞান যে কোরানের বাণীর সাথে সংগতিশীল তা বুঝাতে হবে। বিঁজ্ঞান যেখানে কোরানের সঙ্গে অনৈক্য প্রকাশ করেছে সেখানে কোরানের বক্তব্যকে সঠিক মনে করতে হবে এবং আপাত দৃষ্টিতে বিরোধী ভাবধারার বৈজ্ঞানিক তথ্যকে নিয়ে আরো গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে, যাতে পরিণামে উভয়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।" কোরানে চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়-পর্বতেরও আল্লাহকে সিজদা করার কথা আছে। তাহলে সেগুলিরও প্রাণ আছে কি না জনাব তাজুল ইসলাম অবশ্য তা বলেন নি। এইভাবে একই পুস্তকে ডাঃ মুঃ গোলাম মোয়াযযাম 'চিকিৎসাবিদ্যার ইসলামীকরণ' শিরোনামে খিলেছেন, "... বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানে যেহেতু ইউরোপ থেকে ধর্মবিরোধী পরিবেশ নিয়ে এসেছে তাই এর ইসলামীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।" এখন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা থেকে শুরু করে গোটা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে কিভাবে ইসলামীকরণ সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। ... ইসলামের দৃষ্টিতে শবদেহের কোনরূপ বিকৃতি নিষিদ্ধ। ...ইসলাম সমর্থিত পদ্ধতিতে শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য নিম্নোক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন। (ক) শবদেহকে সম্মানের সঙ্গে নাড়াচাড়া করতে হবে, একটা জড় পদার্থের মতো নয়।... আর এ কাজের জন্য অমুসলিম নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ডোমের পরিবর্তে পরহেজগার কোন মুসলমান নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নারী শবদেহের জন্য নারী কর্মচারী হওয়া বাঞ্ছনীয়।..(ঘ) মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা আল্লাহর নাম স্মরণ করে এবং শুধু শিক্ষার প্রয়োজনে শব-ব্যবচ্ছেদ করছেন এ ধরনের মনোভাব নিয়ে ব্যবচ্ছেদ শুরু করবেন।

... এবার হাসপাতালের পরিবেশ ইসলামীকরণ। ... হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে এবং ওয়ার্ডের ভিতর শিক্ষামূলক কোরআন ও হাদিসের আয়াতসমূহ টানিয়ে রাখতে হবে। ... হাসপাতাল ও কলেজ এলাকায় একটি বড় জামে মসজিদ থাকবে ... এই সমজিদে একজন উপযুক্ত ইমাম যোগ্য বেতনসহ রাখতে হবে যিনি রোজ একবার সকল ওয়ার্ডগুলো ঘুরে বেড়াবেন যাতে কেউ তওবা করতে চাইলে তওবা করাতে পারে বা কেউ কোন মাসলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতে পারে। ... ছাত্র ভর্তির প্রথমেই বলতে হয় যে ইসলাম সহশিক্ষা (কো-এডুকেশন) সমর্থন করে না। সুতরাং পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার তৈরীর জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। ... ইসলামবিরোধী কোন শিক্ষক কিছুতেই প্রতিষ্ঠানে থাকতে পারবে না।" এসব বক্তব্য শুনে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় শিক্ষার দৈন্যদশা বেশ কিছু শিক্ষিত মানুষের মনোজগত কিভাবে এবং কতখানি দখল করে আছে। এদের পুরুষ নেতারা বুর্জোয়া দলের নেত্রীদের সাথে জোট বেঁধে রাজনৈতিক ক্ষমতায় ভাগ বসালে কোন অসুবিধা নেই, শুধু পুরুষ এবং নারী শিক্ষার্থীদের একসাথে শিক্ষালাভ করাতেই যতো আপত্তি! তাছাড়া উপরোক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে, শিক্ষার এই ইসলামীকরণের নামে বাস্তবে কৃষি বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের তেমন কিছুই শিক্ষা হবে না শুধু বিজ্ঞানমনস্কতাকে লুপ্ত করে দিয়ে একটা সাম্প্রদায়িক মনন তথা ফ্যাসিবাদী সাংস্কৃতিক বাতাবরণই সৃষ্টি হবে মাত্র, যা জনগণকে বিভক্ত করতে শোষকশ্রেণীর কাজে লাগবে। নৈতিক শিক্ষার নামে জনাব শামসুল হকের কথিত ধর্ম শিক্ষাও এ ধরনের ফ্যাসিবাদী সাংস্কৃতিক মননকে বাড়িয়ে তুলতেই সাহায্য করবে।

এক কথায় বলা যায়, জনাব শামসুল হকের শিক্ষানীতি প্রস্তাবনা অতীত শাসককুলের শিক্ষাসংকোচন পরিকল্পনারই নব সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়। আমি এ শিক্ষা সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করছি এবং এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের যে কোন সরকারি উদ্যোগকে শিক্ষার অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে প্রতিরোধ করার জন্য সর্বমহলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আরো অনেক প্রসঙ্গ আছে যেগুলো নিয়ে এখানে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। কারণ ৬ দিনে বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ নানা দিক থেকে বহু বিষয়ে আলোচনা করে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অসারতা-অসঙ্গতি এবং শাসকদলের শিক্ষাসংকোচন নীতি ও উদ্দেশ্য খোলাসা করে দেখিয়েছেন। আর আমরা 'শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে' পুস্তিকায় বিভিন্ন বিষয় ধরে পূর্বেই বিশদ আলোচনা করেছি। যদিও এটা ছিল একটা সূত্রপাত মাত্র। আমরা কোন অনড় মনোভাব নিয়ে চলছি না। কারণ আমরা মতামতের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মতের বিকাশ ও পথের সন্ধানে বিশ্বাসী। আমরা এ আলোচনাকে যথাসম্ভব সকল মতামতের কাছে নিয়ে যাব এবং সময়ে একটা সিদ্ধান্তমূলক অবস্থান নিয়ে শিক্ষাআন্দোলনকে নতুন মাত্রায় বিকশিত করার উদ্দেশ্যে গণজোয়ার তৈরীর চেষ্টা চালাবো। আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য, ছাত্র ফ্রন্ট ও অন্যান্য ফ্রন্টসমূহের নেতৃবৃন্দ সবাই দশটি অধিবেশনের পুরো সময় উপস্থিত থেকে সবার বক্তব্য শুনেছেন, এটা আমাদের সিরিয়াস মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে। ফলে আলোচকবৃন্দসহ সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে শিক্ষার এই আন্দোলন অগ্রসর হবে বলে আমরা মনে করি।

এ সম্মেলন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কর্মীদের কাছে কর্তব্যের একটা বড় দায় উপস্থিত করেছে। একথা আপনাদের সদা মনে রাখতে হবে যে-আমাদের মুখের অন্ন, পরার বস্ত্র, লেখার কলম, পড়ার বই, বিদ্যালয় আর বিদ্যার খরচ জোগায় যে নিরন্ন-বুভুক্ষু-শিক্ষাবঞ্চিত হাড়জিরজিরে গ্রাম-শহরের শ্রমজীবী মানুষ, তারা সভ্যতার কারিগর, আমাদের বাবা-মা, স্বজন; এদের প্রতি দায়িত্ব পালনের মনোভাবের বাইরে মনুষ্যত্ব অর্জনের কোন স্থান নেই।

'৫২-'৬২-র ছাত্র-যুবকরা গণমানুষের মুখের ভাষা ও শিক্ষার অধিকার সংরক্ষণের জন্য জীবন দিয়ে জীবনের নতুন মানে খুঁজে পেয়েছিল, '৬৯-'৭১-র গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়ে বাঙালি জাতির হৃদয় দখল করেছিল। আজ বাংলার শূন্যহৃদয়ে স্থান করে নিতে হবে আপনাদের। বইয়ে দিতে হবে প্রাণের বন্যা। ধুয়ে মুছে দিতে হবে অতীত কলঙ্ক। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের দুর্ভেদ্য দেয়াল ভাঙার শপথে রচনা করতে হবে সংগ্রামের নতুন সোপান। শিক্ষাআন্দোলনের পথ বেয়ে আপনাদের এগুতে হবে শোষণমুক্ত সমাজের পানে। জয় আমাদের হবেই। পরিশেষে, সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি।

তথ্যসূচি

১. মনীষার আলোকে ভাষা ও শিক্ষা ঃ সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, ১৯৯৮
২. ঐ
৩. V. I. Lenin-Collected Works, Vol-2, P-90.
৪. মনীষার আলোকে ভাষা ও শিক্ষা ঃ সারাবাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, ১৯৯৮
৫. On Popular Education.
৬. V. I. Lenin-Materialism and Empirio-Criticism, P-222, Foreign Languages Press, Peking, 1976.
৭. Frederick Engels-Anti Duhring, P-123 & 133, Progress Publishers, Moscow, 1995.
৮. শিক্ষা বার্তা, মে ১৯৯৮
৯. Theodore W. Schultz-The Economic Value of Education, P-88, (New York, Columbia U. press-1963).
১০. Edward F. Denison-"Education, Economic Growth and Gaps in Information" in Journal of Pol. Economy, 70 Suppl (Oct. 1962) P-127.
১১. বিকাশমান সমাজ ও শিক্ষা, মুহম্মদ শামসউল হক; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১২. বিজ্ঞান চর্চা ঃ সমকালীন বাংলাদেশ, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা; ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
১৩. শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পৃঃ ১৪২-১৪৩
১৪. বাংলাদেশে শিক্ষাসংকট এবং তার উৎস, মাহবুবুর রহমান; সাহিত্যপত্র, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৭
১৫. শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পৃঃ ২৩৬
১৬. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ এপ্রিল '৯৯
১৭. অতিরিক্ত সচিব শহীদুল আলম, সেমিনারে বক্তব্য; দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ জুলাই '৯৮
১৮. শিক্ষাবার্তা; চতুর্দশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, আগস্ট ২০০১
১৯. Frederick Engles-Anti-Duhring, P-23.
২০. ধর্মনিরপেক্ষতা, আনিসুজ্জামান; রক্ত কমল, ২১ ফেব্রুয়ারি '৯০ সংখ্যা

২১. শিক্ষা প্রবন্ধ সংকলন; 'শিক্ষা' পুস্তক প্রকাশক কমিটি, পৃঃ ১৫
২২. বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনা, বিজ্ঞান চেতনা, পৃঃ ১০
২৩. ঐ
২৪. ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য, শিবদাস ঘোষ
২৫. শিক্ষা-সংস্কৃতি সমস্যা সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিবদাস ঘোষ
২৬. ঐ
২৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার-আমাদের সমস্যা; ঢাকা ১৯৫৯, পৃঃ ৫০
২৮. শিক্ষার মিলন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা
২৯. ইতিহাসে বিজ্ঞান, জে. ডি. বার্নাল; প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৪
৩০. শিক্ষার বিরোধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা
৩১. বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান মনস্কতা ও বিজ্ঞানের সৃষ্টিশীলতা, বিজ্ঞান চর্চা, সমকালীন বাংলাদেশ, পৃঃ ১৬৫
৩২. শিক্ষা প্রবন্ধ সংকলন, 'শিক্ষা' পুস্তক প্রকাশনা কমিটি; পৃঃ ৭৩
৩৩. (ক) জাতীয় শিক্ষা কমিশন - ২০০৩ প্রতিবেদন, (খ) বাংলাদেশ এডুকেশনাল স্ট্যাটিসটিকস ২০০৩, ব্যানবেইস; ডিসেম্বর ২০০৩
৩৪. বিশ্ব পরিচয় ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৫. William Wordsworth-The Prelude, Book sixth, Line 338-341.
৩৬. Frederick Engels-Dialectics of Nature; P-21, 22; Progress Publishers, Moscow.
৩৭. স্বাধীন চিন্তার জন্য শিক্ষা, নিউইয়র্ক টাইমস; ৫ অক্টোবর ১৯৫২
৩৮. শিক্ষা, নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সংকলন; প্রগতি প্রকাশনা, মস্কো, পৃঃ ৫২
৩৯. জে. ব্রনোওস্কি, বিজ্ঞানের চেতনা, বিজ্ঞান ও বোধ, জহুরুল হক অনুদিত, সাহিত্য প্রকাশ, পৃঃ ২০-২১
৪০. নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৪৬
৪১. প্রসঙ্গ ঃ উৎপাদনমুখী শিক্ষা, মকবুল আহমেদ; শিক্ষাবার্তা নির্বাচিত রচনা (১৯৮৭-৯৭), সম্পাদনা ঃ এ এন রাশেদা, দ্বিতীয় খন্ড; পৃঃ ৩৫-৪০
৪২. ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, এম এন রায়; মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা; পৃঃ ৫১-৭৪
৪৩. ভারতের শিক্ষা-ইতিহাস, ডঃ হরিসাধন গোস্বামী; পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; পৃঃ ১৭৩
৪৪. ঐ
৪৫. Rameschandra Majumder-Renascent India, P 31-32.
৪৬. A. Howell-Education in India, P-1.
৪৭. বাঙালির শিক্ষাচিন্তা; প্রথম খন্ড, প্রথম ভাগ; সম্পাদনা ঃ প্রবীর মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা; পৃঃ ১২
৪৮. বিক্ষত বিদ্যাসাগরের নির্বেদ ও নৈরাশ্য ঃ আলী আনোয়ার; মিজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বিদ্যাসাগর সংখ্যা, ১৯৯৭; পৃঃ ১৮-১৯
৪৯. নির্বাচিত প্রবন্ধ, আবুল হুসেন; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; পৃঃ ১৪৬-৬৩
৫০. পাকিস্তান, ধর্ম ও দ্বন্দ্বের রাজনীতি; সম্পাদনা ঃ হাসান গারদেজী ও জামিল রশিদ; ইউপিএল, ঢাকা
৫১. (ক) যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ; মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯৯। (খ) জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৫২. বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা, আবুল মোমেন; শিক্ষাবার্তা নির্বাচিত রচনা (১৯৮৭-১৯৯৭), সম্পাদনা ঃ এ এন রাশেদা, ২য় খন্ড; পৃঃ ২৬৬-২৬৯
৫৩. বিজ্ঞান চর্চা ঃ সমকালীন বাংলাদেশ, ড. এম এ হারুন-অর-রশীদ; পৃঃ ৩৬-৩৭, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা
৫৪. ভোরের কাগজ, ২২ জুলাই '৯৭
৫৫. প্রথম আলো, ১৩ জুলাই '৯৯
৫৬. সংস্কৃতি, ২৫ বছর পূর্তি সংখ্যা; এপ্রিল '৯৯
৫৭. বাংলাদেশের ধর্মশিক্ষার চালচিত্র, আলী আনোয়ার; বাংলাদেশের শিক্ষা ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; বাংলাদেশ লেখক শিবির
৫৮. ইতিহাসে বিজ্ঞান, জে. ডি. বার্নাল
৫৯. বাংলাদেশের ধর্মশিক্ষার চালচিত্র, আলী আনোয়ার; বাংলাদেশের শিক্ষা ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; বাংলাদেশ লেখক শিবির
৬০. দৈনিক নিউ এজ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪
৬১. সাপ্তাহিক অন্বেষা
৬২. সরকারি বা বেসরকারি নয়, শিক্ষার সামাজিকীকরণ চাই ঃ যতীন সরকার; শিক্ষাদর্শন ঃ লক্ষ্য ও সমাজ; সম্পাদনা ঃ এ. এন. রাশেদা, পৃঃ ১১৫
৬৩. শিক্ষা, আইনস্টাইন; শিক্ষা প্রবন্ধ সংকলন, 'শিক্ষা' পুস্তক প্রকাশক কমিটি
৬৪. কাজী মোতাহার হোসেন, শিক্ষা প্রসঙ্গে; সংস্কৃতি কথা
৬৫. শিক্ষাসমস্যা, শিক্ষা; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা
৬৬. ডেইলী স্টার, ১ জুলাই ২০০৪
৬৭. জনকণ্ঠ, ২৮ জানুয়ারি ২০০৪
৬৮. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০০, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
৬৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষাবার্তা নির্বাচিত রচনা (১৯৮৭-৯৭), সম্পাদনা ঃ এ. এন. রাশেদা, ১ম খন্ড; পৃঃ ৪৭

৭০. বিশ্ববিদ্যালয় আধ্যাদেশ ১৯৭৩-এর বিশ বছর ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা, অজয় রায়; শিক্ষাবার্তা নির্বাচিত রচনা (১৯৮৭-১৯৯৭), সম্পাদনা ঃ এ. এন. রাশেদা, ২য় খন্ড; পৃঃ ১২১
৭১. ঐ, পৃঃ ১১৮
৭২. শিক্ষাবিধি; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা পৃঃ ১২৯
৭৩. শিক্ষার বিরোধ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; শরৎ সাহিত্যসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা; পৃঃ ১৯৬৮
৭৪. আমার ধর্ম, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খন্ড; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃঃ ৮
৭৫. শিক্ষকের তপস্যা ও বাংলাদেশের শিক্ষক, যতীন সরকার; শিক্ষাবার্তা নির্বাচিত রচনা (১৯৮৭-১৯৯৭), সম্পাদনা ঃ এ. এন. রাশেদা, ১ম খন্ড; পৃঃ ১৬৮-১৭০
৭৬. শিক্ষকদের মর্যাদা ও অধিকার, আলী আনোয়ার; ঐ; পৃঃ ৮৬-৮৭
৭৭. শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান, ঐ, পৃঃ ২৭
৭৮. শিক্ষাবার্তা, ১০ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
৭৯. পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ডঃ মোকসেদুল হামিদ; শিক্ষাবার্তা, ১ম বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যা, জুন ১৯৮৮
৮০. শিক্ষার বাহন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা
৮১. স্ত্রী জাতির অবনতি, মতিচূর (প্রথম খন্ড); রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী; পৃঃ ২১
৮২. ঐ, পৃঃ ১৯
৮৩. অর্ধাঙ্গী, ঐ; পৃঃ ২৭
৮৪. বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি, ঐ; পৃঃ ২২৩
৮৫. রানী ভিখারিনী; ঐ, পৃঃ ২৩৩
৮৬. স্ত্রী জাতির অবনতি, ঐ; পৃঃ ২১
৮৭. পদ্মরাগ, ঐ; পৃঃ ৩১২
৮৮. নারী, নজরুল রচনাবলী, ১ম খন্ড; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃঃ ২৪৩
৮৯. বাংলাদেশে উপজাতিদের শিক্ষা সংকট ও উত্তরণের প্রস্তাবনা - পরিপ্রেক্ষিত ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, নাজিমুদ্দিন শ্যামল; পৃঃ ৪৯-৬৫ ও ১১১
৯০. শিক্ষার বিরোধ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; শরৎ সাহিত্যসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা; পৃঃ ১৯৬৪
৯১. জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সংকলন ১৯৯৭, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির; প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৭
৯২. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রকাশক ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ; পঞ্চম প্রকাশ ঃ আগষ্ট ১৯৮৮; পৃঃ ১৬-১৭
৯৩. শিক্ষা সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, কেন্দ্রীয় কমিটি; জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠাঃ ২১৬-২১৭
৯৪. ঐ
৯৫. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শিক্ষাবার্তা

সহায়ক গ্রন্থাবলী

ক. জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন, ১৯৫৯ (শরীফ কমিশন)
খ. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, মে ১৯৭৪ (খুদা কমিশন)
গ. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭ (শামসুল হক কমিটি)
ঘ. জাতীয় শিক্ষা কমিশন - ২০০৩ প্রতিবেদন (মনিরুজ্জামান মিঞা কমিশন)
ঙ. সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার